নয়ন রহস্য (উপন্যাস)

(১৯৯০)

ফেলুদা – সত্যজিত রায়

০১. ফেলুদা মনমরা

ফেলুদাকে বেশ কিছুদিন থেকেই মনমরা দেখছি। আমি বলছি মনমরা। সেই জায়গায় লালমোহনবাবু অন্তত বারো রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—একেক দিনে একেক রকম। তার মধ্যে হতোদ্যম, বিষণ্ণ, বিমর্ষ নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ইত্যাদি তো আছেই। এমনকী মেদামারা পর্যন্ত আছে। এর কোনওটাই অবিশ্যি উনি ফেলুদাকে বলেননি, বলেছেন আমাকে। আজ আর থাকতে না পেরে সোজাসুজি ফেলুদাকেই প্রশ্ন করে বসলেন, মশাই, আপনাকে ক'দিন থেকে এত ম্রিয়মাণ দেখছি কেন?

ফেলুদা সোফায় হেলান দিয়ে সামনের কফি-টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল মেঝের দিকে তাকিয়ে; লালমোহনবাবুর প্রশ্নের পরও সেই একইভাবে বসে রইল।

এটা কিন্তু মশাই আনফেয়ার, অভিমানের সুরে বললেন জটায়ু। আমার এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। আপনি দিনের পর দিন এমন বোজার ভাব করলে তো আসা বন্ধ করে দিতে হয়! একটু আলোকপাত করুন, যাতে কী হয়েছে আঁচ করতে পারি। এমন তো হতে পারে যে আপনার এই কন্ডিশনের রেমিডি হয়তো আমি সাপ্লাই করতে পারি। আগে তো আমি ঘরে ঢুকলেই আপনার ভুরু নেচে উঠত, আজকাল দেখছি আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন।

সরি, মেঝের দিকে চেয়েই মৃদুস্বরে বলল ফেলুদা।

নো নিড টুঁ আপলজাইজ, ফেলুবাবু; আপনি কেন গুমরোচ্ছেন সেইটে বলুন, তার পর বাকি কথা হবে। কাইন্ডলি বলুন। এত আনন্দের স্মৃতিভরা ঘর এমন গুমোট মেরে যাবে এটা বরদাস্ত করা যায় না; বলবেন কী হয়েছে?

চিঠি, বলল ফেলুদা।

চিঠি?

চিঠি।

কার চিঠি? এমন কী থাকতে পারে চিঠিতে যা আপনার মনে অন্ধকার আনবে? কার চিঠি মশাই?

পাঠক।

কীসের পাঠক?

শ্রীমান তপোশের লিপিবদ্ধ করা প্রদোষচন্দ্র মিত্রের কীর্তিকলাপ।

পাঠক কি তাতে অবজেকশন নিয়েছে?

পাঠক সিঙ্গুলার নয়, লালমোহনবাবু; পাঠক প্লুর‍্যাল। গুনে দেখেছি। ছাপান্নখানা চিঠিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা।

আমি কিন্তু এইসব চিঠিপত্রের কথা কিছুই জানি না! ফেলুদা রোজই চার-পাঁচটা করে চিঠি পায় সেটা জানি, কিন্তু সেগুলো কী চিঠি সেটা কোনও দিন জিজ্ঞেস করিনি।

একই কথা মানে? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু। কী কথা?

ফেলুমিত্তিরের মামলা আর তেমন জমাটি হচ্ছে না, জটায়ু আর তেমন হাসাতে পারছেন। না, তপোশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে... লালমোহনবাবু হঠাৎ খেপে উঠলেন। –হাসাতে পারছেন না? জটায়ু হাসাতে পারছেন না? আমি কি সং?

না না, ফেলুদা বলে উঠল, আপনি সং হতে যাবেন কেন? সং, ভাঁড়, ক্লাউন, জোকার-এ সব অত্যন্ত অপমানকর কথা। আপনি হলেন বিদুষক। এইভাবে নিজেকে কল্পনা করে নিলে দেখবেন আমার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

কথাটায় লালমোহনবাবুর রাগ তো গেলেই না, বরং তিনি বেশ বিরক্তির সঙ্গে ফেলুদার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বললেন, আই অ্যাম রিয়েলি ডিস্যাপয়েন্টেড। হ্যাঁ ছা ছদ্মা—এইসব চিঠি আপনি জমিয়ে রেখেছেন? পাওয়ামাত্র দল পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করেননি?

না, করিনি, গম্ভীরভাবে বলল ফেলুদা, কারণ এই সব পাঠকই এতকাল আমাকে সাপোর্ট করেছে; এখন যদি তারা বলে যে, থ্রি মাসকেটিয়ার্স-এর অকাল বার্ধক্য দেখা দিয়েছে, তা হলে কথাটা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।

অকাল বার্ধক্য। হাঁটুতে চাপড় মেরে চোখ কপালে তুলে বললেন জটায়ু। তপেশের কথা ছেড়েই দিলাম—আপনি তো সুপারফিট চিরতরুণ। তপেশও আপনারই মতা রেগুলার যোগব্যায়াম করে। শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। আর আমি যে আমি-এখনও। -এই সে দিনও—আমার পড়শি—সেভেনটিন ইয়ারস মাই জুনিয়র-সোমেশ্বর হাজরাকে পাঞ্জায় কাত করে দিলুম। –সেটা বার্ধক্যের লক্ষণ? বয়স তো মানুষের বাড়বেই, কিন্তু সেই সঙ্গে যে আক্কেলও বাড়ে, অভিজ্ঞতাও বড়ে তার কি কোনও দাম নেই?

এটা বোঝাই যাচ্ছে যে, সে সন্ধের কোনও পরিচয় পাঠকরা পাচ্ছে না।

এও তো এক রহস্য। কিনারা করতে পারলেন?

ফেলুদা টেবিল থেকে পা দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

শুনুন, লালমোহনবাবু-জনপ্রিয়তার লেজুড় হিসেবে বেশ কিছু ঝক্কি এসে পড়ে সেটা আপনারও অজানা নয়। প্রকাশকের চাপ আপনাকে ভোগ করতে হয় না?

ওরেব্বাস-সে তো ট্রিমেন্ডাস ব্যাপার?

জানি। কিন্তু ফেলুদার জনপ্রিয়তা আর প্রখর রুদ্রের জনপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। আপনার উপর চাপ এলে আপনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সাপ-ব্যাঙ-বিছু যা হয় একটা দাঁড় করিয়ে প্রকাশকের চাহিদা মেটাতে পারেন। কিন্তু তোপ্‌সের উপর যখন চাপ আসে তখন কল্পনার আশ্রয় নিলে চলে না। বাস্তবে আমার মামলায় যা ঘটেছে, সেটাকেই একটু পালিশ করে উপন্যাসের আকারে প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে হয়। তার মাস খানেকের মধ্যেই ফেলুদার একটি টাট্‌কা নতুন অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের বাজার দখল করে বসে। তার একটা ফল হল এই ছাপান্নখানা চিঠি। কারণ আর কিছুই নয়; প্রতি বছরই যে আমার হাতে এমন একটি মামলা আসবে যা থেকে জমাটি উপন্যাস হয় তার কী গ্যারান্টি আছে? এটা ভুললে চলবে না। যে, আমার পাঠক প্রধানত কিশোর-কিশোরী। আমার এমন অনেক মামলার উদাহরণ দিতে পারি। যেগুলো চিত্তাকর্ষক হলেও, তাতে এমন সব উপাদান থাকে যা কখনওই কিশোরদের পাতে দেওয়া চলে না।

যেমন লখাইপুরের সেই জোড়া খুনের মামলা?

তা তো বটেই। সেটাতে তো তোপ্‌সেকে আমার ধারে-পাশেই আসতে দিইনি—যদিও সে এখন আর খোকাটি নেই, এবং বয়সের তুলনায় অনেক বেশি জানে-বোঝে।

তার মানে আপনি বলতে চান যে, তোপ্‌সের বাছাইয়ে গলদ রয়েছে?

সেটা হত না যদি না ও প্রকাশকের তাগিদের চোটে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ন্ত। ওকে দোষ দিই। কী করে বলুন? আমার মামলা থেকে ও যা খাড়া করে তাকে কিশোর উপন্যাসই বলা হয়ে থাকে। এইসব উপন্যাস যদি শুধু কিশোররাই পড়ত, তা হলে কিন্তু কোনও সমস্যা ছিল না; আসলে যেটা ঘটে সেটা হল, কিশোরদের সঙ্গে তাদের মা, বাবা, মাসি, পিসি, খুড়ো, জ্যাঠা সকলেই এসব উপন্যাস পড়ে। একসঙ্গে এত স্তরে চাহিদা মেটানো কি চাট্টিখানি কথা?

আপনি তপেশকে একটু গাইড করুন না। সেটা করব। আগে করতাম, ইদানীং করি না। আবার করব। তবে তার আগে প্রকাশকের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করা দরকার। তাদের বোঝাতে হবে যে, লাগসই মামলা পেলেই তারা উপন্যাস পাবে, নচেৎ নয়। তাতে যদি একটা বছর ফেলুদা বাদও যায়, সেটাও। তাদের মেনে নিতে হবে। তারা ঘোর ব্যবসাদার; আমার মান-ইজত নিয়ে তারা চিন্তিত নয়—সে চিন্তা আমাদেরই করতে হবে।

পাঠকদের সঙ্গেও তো একটা মোকাবিলার প্রয়োজন, তাই নয় কি? এই যে সব যারা রাগী-রাগী চিঠি দিল?

এরা বোকা নয়, লালমোহনবাবু। এদের চাহিদা অত্যন্ত সঙ্গত। সেটা মেটাতে পারলেই এরা আবার আমাকে তুলে ধরবে।

শুধু আপনাকে? আমাকে নয়?

একশোবার! আপনি-আমি তো পরস্পরের পরিপূরক। সোনায় সোহাগা। অ্যারালভাইট দিয়ে আমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন। আপনি সেই সোনার কেল্লার সময় থেকেই। আমাকে ছাড়া আপনার অস্তিত্বই নেই—অ্যান্ড ভাইসি ভারসা।

লালমোহনবাবু আমার দিকে ফিরে গভীর গলায় বললেন, বি ভেরি কেয়ারফুল, তপেশ! এটা বলার কোনও দরকার ছিল না, কারণ ফেলুদা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এবার থেকে কেয়ারফুল হবার অর্ধেক দায়িত্ব ওর।

কথার ফাঁকে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়েছিল। এবার সেটা আধাপোড়া অবস্থায় অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, সোজা নিয়ম, বুঝলি তোপ্‌সে। এবার থেকে আমার গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত তুই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকিবি। ঠিক হ্যায়?

আমি হেসে মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম ঠিক হ্যায়।

০২. গ্রিন সিগন্যাল

এই যে এতক্ষণ পঁয়তারা করলাম, তা থেকে বোঝাই যাবে যে, ফেলুদা আমায় গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে। শুধু ফেলুদা কেন, নয়নের মামলা নিয়ে লিখছি শুনে জটায়ু একটা কান-ফাটানো হাততালি দিয়ে বললেন, গ্রেট! গ্রেট! ইয়ে, আমার ভূমিকাটা ইনট্যাক্ট থাকবে তো? সব কিছু মনে আছে তো? আমি বললাম, কোনও চিন্তা নেই; সব নোট করা আছে।

আসল মামলায় পৌঁছতে অবিশ্যি আরও কিছুটা সময় লাগবে। কোথায় শুরু করব জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, তরফদারের শো। দ্যাট ইজ দ্যা স্টার্টিং পয়েন্ট। আমি ওর কথামতোই স্টার্ট করছি।

তরফদার হলেন ম্যাজিশিয়ান। পুরো নাম সুনীল তরফদার। শোয়ের নামচমকদার তরফদার। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো ম্যাজিশিয়ান গজাচ্ছে এই পশ্চিম বাংলায়। এর মধ্যে কিছু আছে যারা সত্যিই ম্যাজিক নিয়ে সাধনা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে অনেককেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়। যারা টিকে থাকে তাদের মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। ইয়াং বয়সে ফেলুদার ম্যাজিকের নেশা ছিল, সেটা আমিই একটা গল্পে জানিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে এ সব উঠতি ম্যাজিশিয়ানদের অনেকেই ওর কাছে আসে শোয়ে নেমন্তন্ন করার জন্য। আমরা কয়েকবার গিয়েছি, আর গিয়ে হতাশ হইনি।

সুনীল তরফদারও এই উঠতিদের মধ্যে একজন। বছর খানেক হল শো করছেন। এখনও তেমন নাম করেননি, যদিও দু-একটা কাগজে বেশ প্রশংসা বেরিয়েছে। গত ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে এক দিন সকালে ইনি আমাদের বাড়িতে এসে ফেলুদাকে টিপ করে এক প্রণাম করলেন। কেউ ওর পায়ে হাত দিলে ফেলুদা ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে; তরফদারের প্রণামে ও হাঁ হাঁ করে উঠল।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ-বিত্রিশের বেশি নয়, লম্বা একহারা চেহারা, ঠোঁটের উপরে একটা সরু সাবধানে-ছটা গোঁফ। প্রণাম সেরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, স্যার, আমি আপনার একজন গ্রেট ফ্যান। আমি জানি এককালে আপনার নিজেরই ম্যাজিকের শখ ছিল। আমার শো হচ্ছে মহাজাতি সদনে। আপনাদের জন্য তিনটে ফাস্ট রোয়ের টিকিট দিয়ে যাচ্ছি। আগামী রুবিধার সাড়ে ছুটয় যদি আপনার আসেন তা হলে আমি সত্যিই খুশি হব।

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হ্যাঁ না কিছুই বলছে না দেখে ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি আপনাদের রোববার ডাকছি। এই কারণে যে, সেদিন আমার প্রোগ্রামে একটা নতুন আইটেম অ্যাড করছি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এ জিনিস আর কেউ কখনও স্টেজে দেখায়নি।

ফেলুদা যাব বলে কথা দিয়েছিল। রবিবার বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় লালমোহনবাবু তাঁর সবুজ অ্যাশ্বাসাড়র নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। চা-ডালমুট খেয়ে আমরা ছ। টায় রওনা হয়ে শোয়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে মহাজাতি সদনে পৌঁছে গেলাম। কাগজে বেশ চোখে পড়ার মতো একটা বিজ্ঞাপন দুদিন আগেই বেরিয়েছিল, ভিড়

দেখে মনে হল সেটায় কাজ দিয়েছে। আমরা মাঝের প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনের সারির মাঝামাঝি পাশাপাশি তিনটে চেয়ারে বসলাম।

কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলেন? ফেলুদার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

দেখেছি, বলল ফেলুদা।

তাতে যে বলছে অভূতপূর্ব নতুন আকর্ষণ জ্যোতিষ্ক-এই জ্যোতিষ্কটি কী বস্তু, মশাই? একটু ধৈর্য ধরুন—যথাসময়ে জানতে পারবেন।

তরফদার দেখলাম পাংচুয়ালি সাড়ে ছটায় শো আরম্ভ করে দিলেন। পদর্ণ সরাতেই ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ নিজের রিস্টওয়াচের দিকে, ভুরু ঈষৎ তোলা, আর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি; আমি তো জানি ও পাংচুয়ালিটির উপর কত জোর দেয়। ও বলে বাঙালিদের উন্নতির পথে একটা বড় রকম বাধার সৃষ্টি করে এই সময়ানুবর্তিতার অভাব। তরফদার যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেটা দেখেই ফেলুদা খুশি।

শো কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝতে পারলাম, জাদুকরের ঝলমলে পোশাক ছাড়া আজকের সফল ম্যাজিশিয়ানদের তুলনায় ইনি জাঁকজমকের দিকটায় একটু কম দৃষ্টি দেন। এও লক্ষ করলাম যে এমন অনেক আইটেম আছে, যাতে নতুনত্ব বলে বিশেষ কিছু নেই।

ইন্টারভ্যালের পর প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশে এল প্রথম চমক। এটা স্বীকার করতেই হল যে, হিপনটিজম বা সম্মোহনে তরফদারের সমকক্ষ বাঙালি জাদুকরের মধ্যে আর নেই বললেই চলে। তিনজন দর্শককে পর পর স্টেজে এনে চোখের দৃষ্টি আর আঙুল-ছাড়ানা দুই হাতের আন্দোলনের জোরে সম্মোহিত করে তাদের দিয়ে যা-খুশি-তাই করিয়ে ভদ্রলোক প্রচুর হাততালি পেলেন।

কিন্তু তার পরেই তরফদার একটা বেচাল চললেন। ফেলুদার দিকে চেয়ে দর্শকদের উদ্দেশ করে বললেন, আমি এবার প্রথম সারিতে বসা স্বনামধন্য গোয়েন্দাপ্রবর শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসতে।

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে জটায়ুর দিকে দেখিয়ে বলল, আমাকে না ডেকে এই ভদ্রলোককে ডাকুন। আমাকে ডাকলে বিপত্তির সম্ভাবনা আছে।

তরফদারের বয়স বেশি না বলেই হয়তো তিনি একটু একরোখা। একটা ভয়ংকর রকম কনফিডেন্ট হাসি হেসে বললেন, না স্যার, আমি চাই আপনিই আসুন।

বিপত্তি কথাটা ভুল নয়; তরফদারের বার বার নানারকম চেষ্টা সত্ত্বেও ফেলুদা যেমন সজাগ তেমনই সজাগ রয়ে গেল। এদিকে আমার অপ্রস্তুত লাগছে; হলে ভর্তি লোক, তার মধ্যে ম্যাজিশিয়ানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। শেষে তরফদার যেটা করলেন সেটাই বোধহয় এই অবস্থায় মান বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

তিনি সবিনয়ে হার স্বীকার করে দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, ফেলুমিত্তির বস্তুটা যে কী, সেটা আপনাদের দেখানোর জন্যই আমি একে মঞ্চে ডেকেছিলাম। এর কাছে হার স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। আমি চাই আপনারা এই আশ্চর্য মানুষটিকে যথোপযুক্ত সন্মান দেখান।

হল হাততালিতে ফেটে পড়ল। ফেলুদা স্টেজ থেকে নেমে নিজের জায়গায় এসে বসতে লালমোহনবাবু তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, আপনার মশাই ফিজিয়লজিটাই আলাদা।

কিন্তু একটা চূড়ান্ত চমক—যেটা আমার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল—এখনও বাকি ছিল। সেটাই তরফদারের নতুন এবং শেষ আইটেম।

যাকে নিয়ে এই আইটেম, সে হল আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে—যাকে সঙ্গে নিয়ে তরফদার মঞ্চে হাজির হলেন। একটা বেশ বাহারের চেয়ার স্টেজের মাঝখানে রাখা ছিল, ছেলেটিকে তাতে বসিয়ে তরফদার দর্শকদের দিকে ঘুরে বললেন, এই বালকের নাম জ্যোতিষ্ক; এর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় আপনারা এখনই পাবেন। আমি স্বীকার করছি এতে আমার কোনও বাহাদুরি নেই। একে মঞ্চে উপস্থিত করতে পেরে আমি গর্কিত। এ ছাড়া আমার আর কোনও ক্রেডিট নেই।

এবার তরফদার ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন, জ্যোতিষ্ক, দর্শকদের দিকে দেখো তো।

ছেলেটির দৃষ্টি সামনের দিকে ঘুরল।

তরফদার বললেন, সামনের সারিতে প্যাসেজের ডান দিকে লাল সোয়েটার আর কালো প্যান্ট পরা যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন, তাঁর কাছে কি কোনও টাকা আছে?

যাঁর কথা বলা হচ্ছে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আছে, মিহি, সুরেলা গলায় বলল জ্যোতিষ্ক।

কত টাকা বলতে পার?

পারি

কত?

কুড়ি টাকা তিরিশ পয়সা।

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পকেট থেকে পার্স বার করে তার থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করেছেন। প্যাসেজের ওদিকে বসলেও দিব্যি বুঝতে পারছি যে, ভদ্রলোকের চোখ ছানাবিড়া, মুখ হ্যাঁ।

ওনার হাতে যে দুটো দশ টাকার নেট, তার নম্বর বলতে পার?

এগারো ই-এক এক এক তিন শূন্য দুই। আর চোদ্দ সি–দুই আট ছয় শূন্য দুই পাঁচ।

ভদ্রলোকের ভুরু আরও ইঞ্চিখানেক উপরে উঠে গেল।

মাই গড—হি ইজ অ্যাবসোলিউটলি রাইট!

চারদিক থেকে তুমুল হাততালি আর উচ্ছাসের কোরাস।

এবার তরফদার দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, এখন অবিশ্যি আমি জ্যোতিষ্ককে প্রশ্ন করছি, কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনাদের যে কেউ করতে পারেন। শুধু এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্ন এমন হতে হবে যার উত্তর সংখ্যায় হয়। এই ভাবে উত্তর দিতে জ্যোতিষ্কর যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হয়, যদিও সেটা বাইরে থেকে বোঝা নাও যেতে পারে। তাই জ্যোতিষ্ক আর মাত্র দুটো প্রশ্নের জবাব দেবে, তার পর তার ছুটি।

দুটোর একটায় একজন তরুণ দর্শক প্রশ্ন করল, আমি এখানে এসেছি মোটর গাড়িতে। সে গাড়ির নম্বর তুমি বলতে পার?

জ্যোতিষ্ক নম্বর বলে দিয়ে বলল, তোমাদের কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা গাড়ি আছে। সেটার নম্বর ডব্লিউ এম এফ ছয় দুই তিন দুই।

তারপর তরফদার একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর কোনও পরীক্ষা দিয়েছ?

মাধ্যমিক, বলল ছেলেটা। তরফদার জ্যোতিষ্কর দিকে ফিরে বললেন, এই ছেলেটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় কত নম্বর পেয়েছে বলতে পার?

জ্যোতিষ্ক বলল, একাশি। ওর চেয়ে বেশি কেউ পায়নি।

উত্তর শুনে ছেলেটি নিজেই হাততালি দিয়ে উঠল।

শোয়ের পর ফেলুদা বলল, এক বার ব্যাকস্টেজে যাওয়া দরকার। তরফদারকে একটা ধন্যবাদ তো দিতেই হয়।

আমরা গেলাম। তরফদার আয়নার সামনে বসে মেক-আপ তুলছেন—আমাদের দেখেই এক-গাল হেসে উঠে দাঁড়ালেন।

কেমন লাগল ফ্র্যাঙ্কলি বলুন, স্যার।

দুটো আইটেমের তারিফ করতেই হয়, বলল ফেলুদা। এক, আপনার হিপ্‌নটিজম, আর দুই–জ্যোতিষ্ক। কোত্থেকে পেলেন এই আশ্চর্য ছেলেকে?

কালীঘাটের ছেলে। ওর আসল নাম নয়ন; জ্যোতিষ্ক নামটা আমিই দিয়েছি; বিজ্ঞাপনেও জ্যোতিষ্কই ব্যবহার করছি। কথাটা আপনাদের বললুম, আপনারা কাইন্ডলি আর কাউকে বলবেন না।

না না, বলল ফেলুদা। কিন্তু শুধু কালীঘাট বললে তো কিছুই বলা হল না।

বাপ অসীম সরকার থাকেন নিকুঞ্জবিহারী লেনে! ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমার কাছে নিয়ে আসেন। যদি আমি ওকে কাজে লাগাতে পারি। আসলে ভদ্রলোক অভাবী, তাই ভাবলেন ছেলেকে দিয়ে যদি কিছু একস্ট্রা ইনকাম হয়।

সেটা যে হবে সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ নেই, ছেলেটি কি বাপের কাছেই থাকে?

আজ্ঞে না। আমি ওকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছি! ওর পড়াশুনোর জন্য টিউটর ঠিক করেছি; কাল এক ডাক্তারকে ডেকেছিলাম, উনি নয়নের ডায়েট বাতলে দিয়েছেন।

এ সব তো রীতিমতো খরচের ব্যাপার!

জানি স্যার। তবে এও জানি যে, নিয়ন ইজ এ গোলন্ডমাইন। ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি ধার-দেনাও করতে হয়, সে টাকা ক'দিনের মধ্যে উঠে আসবে।

হুঁ...তবে আইডিয়াল হত যদি আপনি একটি পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করতে পারতেন।

সেটা আমিও বুঝি স্যার। দেখি আর দুটো দিন...

আপনার অনেকটা সময় নিয়েছি। আর মাত্র দুটো কথা বলে আপনাকে রেহাই দেব। এক—এই স্বর্ণখনিটি যাতে বেহাত না হয়, সেদিকে আপনার কড়া নজর রাখতে হবে। সেকেন্ড রো-তে মনে হল। কয়েকজন সাংবাদিককে দেখলাম, তাই না?

ঠিক দেখেছেন, স্যার। এগারোজন সাংবাদিক আজকে আমার শো দেখেছেন। তারা সকলেই আগামী শুক্রবারের সিনেমার পাতায় আমার শোয়ের বিষয় লিখবেন। ইতিমধ্যে কোনও চিন্তার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

যাই হোক, এটা বলে গেলাম যে, যদি নয়ন সম্বন্ধে কোনও এনকোয়ারি বা টেলিফোন আসে যা আপনার মনে খটকা জাগায়, তা হলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।

মেনি থ্যাঙ্কস, স্যার। এবার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।

কী?

এবার থেকে আমায় আপনি না বলে তুমি বলবেন কাইন্ডলি।

০৩. শুক্রবারের কাগজ

শুক্রবারের কাগজে নয়ন সম্বন্ধে বেরোনোর কথা; আজ মঙ্গলবার। বেশ অবাক হলাম দেখে যে, আজই তরফদারের কাছ থেকে টেলিফোন এল। শুধু ফেলুদার দিকটা শুনে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলাম না; ফোন রাখার পর ফেলুদা খুলে বলল।

খবরটা এর মধ্যেই ছড়িয়েছে, বুঝেছিস তোপ্‌সে। আটশো লোক সেদিন ম্যাজিক দেখেছে; তার মধ্যে কতজন কত লোককে নয়ন সম্বন্ধে বলেছে কে, জানে? ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে—তরফদার চারজনের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছে! হেঁজিপোঁজি নয়, বেশ মালদার লোক। তারা সকলেই নয়ন সম্বন্ধে কথা বলতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়। তরফদার কাল সকাল নটা থেকে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট রেখেছে। প্রত্যেককে পনেরো মিনিট সময় দেবে। এও বলে দিয়েছে যে, তার সঙ্গে আরও তিনজন লোক থাকবে—অর্থাৎ মিস্টার ফেলু, মিস্টার তপেশ আর মিস্টার লালু। এই খবরটা তুই এক্ষুনি ফোন করে জটায়ুকে জানিয়ে দে।

কিন্তু এই চারজন করা, সেটা তরফদার বললেন না?

একজন আমেরিকান, একজন পশ্চিমা ব্যবসাদার, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, একজন বাঙালি। আমেরিকানটি নাকি ইমপ্রেসারিও। অর্থাৎ নানা রকম শিল্পীদের স্টেজে উপস্থিত করেন এবং তা থেকে দু পয়সা কামান। অন্য তিনজন কী তা গেলে জানা যাবে। আসল কথা যা বুঝলাম-তরফদার বুঝেছে সে একা সিচুয়েশনটা হ্যান্ডল করতে পারবে না; তাই আমাদের ডাকা।

লালমোহনবাবুকে ফোন করাতে ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে চলেই এলেন। শ্রীনাথ! বলে একটা হাঁক দিয়ে তাঁর প্রিয় কাউচটাতে বসে বললেন, একটা চেনা-চেনা গন্ধ পাচ্ছি যে মশাই, কী ব্যাপার?

এখন পর্যন্ত গন্ধ পাবার কোনও কারণ নেই, লালমোহনবাবু। এটা নিছক আপনার কল্পনা।

আমি মশাই কাল থেকে ওই খোকার কথা ভাবছি। কী অদ্ভুত ক্ষমতা বলুন তো! কিছুই বলা যায় না, বলল ফেলুদা, এক দিন হয়তো দেখবেন হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ক্ষমতাটা লোপ পেয়ে গেছে। তখন আর-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে নয়নের কোনও তফাত থাকবে না।

কাল তা হলে আমরা তরফদারের ওখানে মিট করছি?

ইয়েস, এবং একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—আমি কিন্তু কাল গোয়েন্দা হিসেবে যাচ্ছি। না। আমি হব নির্বাক দর্শক। যা কথা বলার তা আপনি বলবেন।

এটা আপনি রিয়েলি মিন করছেন?

সম্পূর্ণ।

ঠিক হ্যায়। জয় মা তারা বলে লেগে পড়ব।

*

একডালিয়া রোডে তরফদারের বাড়ি। মাঝারি দোতলা বাড়ি—অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো তো বটেই। গেটে সশস্ত্র দারোয়ান; বুঝলাম ফেলুদার সতর্কবাণীতে ফল হয়েছে।

ফেলুদার নাম শুনে দারোয়ান গেট খুলে দিল, আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই ডাইনে এক ফালি বাগান, তাতে কেয়ারির কোনও বালাই নেই। সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, দেখবি উইদিন টু ইয়ারস তরফদার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

কোথায় যাবে?

সাম অট্টালিকা।

সদর দরজার দারোয়ানও আমাদের সেলাম ঠুকে ভিতরে যেতে দিল।

আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেটা ল্যান্ডিং, বাঁয়ে সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় বেশ ভদ্র পোশাক পরা একজন চাকর-বেয়ারা বলাই বোধহয় ঠিক হবে—আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, আসুন আপনারা। আমরা চাকরের পিছন পিছন গিয়ে বৈঠকখানায় হাজির হলাম।

বসুন; বাবু আসছেন।

এই ঘরের সাইজও মাঝারি, তবে আসবাবপত্রে বেশ রুচির পরিচয় আছে। দুটো সোফায় ভাগাভাগি করে আমরা তিনজন বসলাম।

গুড মর্নিং!

ম্যাজিশিয়ান হাজির, তবে একা নন। তাঁর পাশে একটি বিরাট অ্যালসেশিয়ান দণ্ডায়মান। আমি জানি ফেলুদা কুকুরের ভক্ত, আর যত বড় যত ভীতিজনক হাউন্ডই হোক না কেন, পোষা জানলে তার পিঠে হাত বোলানোর লোভ সামলাতে পারে না। এখানেও তাই করল।

এর নাম বাদশা, বললেন তরফদার। বয়স বারো। খুব ভাল ওয়াচ-ডগ।

এক্সেলেন্ট! আবার সোফায় বসে বলল ফেলুদা। আমরা কিন্তু তোমার কথামতো পনেরো মিনিট আগেই এসেছি।

আপনি যে পাংচুয়াল হবেন সেটা আমি জানতাম, তৃতীয় সোফায় বসে বললেন তরফদার।

তোমার এ বাড়ি কি ভাড়া বাড়ি? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আজ্ঞে না। এ বাড়ি আমার বাবার তৈরি। উনি নামকরা অ্যাটর্নি ছিলেন। আর একটা বাড়ি আছে-ওল্ড বালিগঞ্জ রোড়ে। সেটায় আমার দাদা থাকেন। দুই ভাইকে দুটো বাড়ি উইল করে দিয়ে যান। বাবা মারা যান এইট্রি-ফোরে। আমি এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছি।

আপনি সংসার করেননি? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

আজ্ঞে না, মৃদু হেসে বললেন তরফদার। তাড়া কী? আগে শো-টাকে দাঁড় করাই।

চা এসে গেছে, সঙ্গে শিঙাড়া। ফেলুদা একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল, আজ কিন্তু আমি শ্রোতা! কিছু বলার থাকলে ইনি বলবেন। ফেলুদা জটায়ুর দিকে নির্দেশ করল। ইনি কে জানি তো?

তা জানি বইকী? চোখ কপালে তুলে বললেন তরফদার। বাংলার নাম্বার ওয়ান রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক।

লালমোহনবাবু কোনও দিন চেষ্টা করেও বিনয়ী ভাব প্রকাশ করতে পারেননি; এখন একটা সেলুটে বুঝিয়ে দিলেন তিনি চেষ্টাই করছেন না।

ফেলুদা হাতের কাপ টেবিলে রেখে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা অকপটে বলছি, সুনীল। তোমার শোয়ে শোম্যানশিপের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ করলাম। আজকের উঠতি জাদুকরদের কিন্তু ও দিকটা নেগলেক্ট করলে চলে না। তোমার হিপ্‌নটিজম, আর তোমার নয়ন—দুটোই আশ্চর্য আইটেম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের দর্শক জাঁকজমকটাও চায়।

জানি। আমার মনে হয় সে অভাব। এবার পূরণ হবে। অ্যাদ্দিন যে হয়নি তার একমাত্র কারণ পুঁজির অভাব।

সে অভাব মিটাল কী করে? ভুরু তুলে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

সুখবরটা দেবার মওকা খুঁজছিলাম। —আমি একজন ভাল পৃষ্ঠপাষক পেয়েছি, স্যার।

এই সেদিনই বলছিলাম, আর এর মধ্যেই...?

হ্যাঁ স্যার। আপাতত আর কোনও ভাবনা নেই।

কিন্তু কে সেই ব্যক্তি সে কি জানতে পারি?

কিছু মনে করবেন না, স্যার—তিনি তাঁর নামটা উহ্য রাখতে বলেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কী করে সেটা বলাও কি বারণ?

মোটেই না। এই ভদ্রলোকের এক নিকট-আত্মীয় গত রবিবার আমার শো দেখে সেই রাত্রেই ভদ্রলোককে নয়নের কথা বলেন। রাত দশটায়। ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি ফোন পাই। তিনি বলেন যে, অবিলম্বে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আমি পর দিনই সকাল দশটায় সময় দিই। উনি কটায় কাঁটায় দশটায় এসে হাজির হন। তার পর বৈঠকখানায় এসে বসে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন জ্যোতিষ্ককে কীভাবে দেখা যায়। নয়ন আমার কাছেই থাকে জেনে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ নয়নকে ডেকে পাঠাতে বলেন। নয়ন এলে পর ভদ্রলোক তাকে দু-একটা এমন প্রশ্ন করেন যার উত্তর সংখ্যায় হয়। নয়ন অবশ্যই ঠিক ঠিক জবাব দেয়। ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ নয়নের দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে

কী প্রস্তাব?

প্রস্তাবটা আমাকে হাতে চাঁদ পাইয়ে দিল। উনি বললেন আমার শোয়ের সব খরচ উনি বহন করবেন। একটা কোম্পানি স্থাপন করবেন যার নাম হবে মিরাকলস আনলিমিটেড। এই কোম্পানির মালিক কে তা কেউ জানবে না। এই কোম্পানির হয়েই আমি শো করব। তা থেকে খ্যাতি যা হবে তা আমার, খরচ হয়ে লাভ যা হবে তা ওঁর। আমাকে উনি মাসোহারা দেবেন যাতে আমার আর নয়নের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। ..আমি অবিশ্যি এ প্রস্তাবে রাজি হই, কারণ আমার মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাচ্ছে এতে।

কিন্তু এমন সুযোগ উনি হঠাৎ কেন দেবেন। সে কথা জিজ্ঞেস করনি?

স্বভাবতই করেছি, এবং উনি তাতে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন। ওনার শখ ছিল পেশাদারি জাদুকর হবেন। ইস্কুল থেকে শুরু করে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত উনি সমানে ম্যাজিক অভ্যাস করেছেন, ম্যাজিকের বই আর সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন। বাদ সাবলেন। ওঁর বাবা। তিনি ছেলের এই নেশা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। একদিন ঘটনাচক্রে জানতে পেরে রেগে আগুন হয়ে ছেলের ম্যাজিকের সব সরঞ্জাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে জোর করে তাকে ব্যবসায় নামান। অসম্ভব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন বাবা, তাই ছেলে তাঁর শাসন মেনে নেন। শুধু তাই নয়, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভাল রোজগার করতে শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ম্যাজিকের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ভদ্রলোক বললেন, আমি রোজগার করেছি। অনেক কিন্তু তাতে আমার আত্মার তৃপ্তি হয়নি। এই ছেলেকে দেখে বুঝতে পারছি এই আমার জীবনে সার্থকতা এনে দেবে।

তোমার সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন অত্যন্ত হালকা বোধ করছি। নয়নের মাস্টার, ডাক্তার, জামাকাপড়—সব কিছুর খরচ উনি দিচ্ছেন। একটা প্রশ্ন অবিশ্যি উনি আমাকে করেন, সেটা হল কলকাতার বাইরে ভারতবর্ষের অন্য বড় শহরে শো করার অ্যামবিশান আমার আছে কি না। আমি জানাই যে সেদিনই সকলে আমি ম্যাড্রাস থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছি মিঃ রেড্ডি নামে এক থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে। রবিবার রাত্রে আমার শো দেখে ভদ্রলোকের একজন কলকাতাবাসী সাউথ ইন্ডিয়ান বন্ধু রেড্ডিকে নয়নের কথা টেলিফোনে জানান। তাই পরদিন সকালেই রেড্ডি

আমাকে ফোন করেন। খবরটা শুনে পৃষ্ঠপোষক জানতে চাইলেন আমি রেডিড়কে কী বলেছি। আমি বললাম-আমি ভাববার জন্য সময় চেয়েছি। তাতে পৃষ্ঠপোষক বলেন, তুমি এক্ষুনি রেডির আমন্ত্রণ অ্যাকসেপ্ট করছ বলে টেলিগ্রাম করে। দক্ষিণ ভারত সফরে যাবে তুমি। শুধু ম্যাড্রাস নয়, আরও অন্য শহরে শো করবে তুমি। সব খরচ আমার।

তোমাকে খরচের হিসাব দিতে হবে না? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

তা তো বটেই, বললেন তরফদার। সে কাজের ভূগর নেবে। আমার ম্যানেজার ও বন্ধু শঙ্কর। ও খুব এফিশিয়েন্ট লোক।

পনেরো মিনিট যে চলে গেছে সেটা টের পেলাম যখন চাকর এসে বলল যে একটি সাহেব। আর তার সঙ্গে একটি বাঙালিবাবু এসেছেন।

এখানে নিয়ে এসো বললেন তরফদার।

জটায়ু দেখলাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসলেন, কারণ এখন থেকে ফেলুদা নির্বাক।

সাহেবের মাথায় ধবধবে সাদা চুল হলেও বয়স যে বেশি না, সেটা চামড়ার টান ভাব দেখেই বোঝা যায়।

তরফদার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আগন্তুকদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। ফেলুদা জায়গা করে দেবার জন্য আমাদের সোফাতেই লালমোহনবাবুর পাশে এসে বসল।

আমার নাম স্যাম কেলারম্যান, বললেন সাহেব। আর ইনি আমার ইন্ডিয়ার রিপ্রেজেনটিটিভ মিস্টার ব্যাস্যাক।

লালমোহনবাবু কাজে লেগে গেলেন।

ইউ আর অ্যান ইমপ্রেস্যোরিয়া-থুড়ি, ইমপ্রেসারিও?

ইয়েস। আজকাল ভারতীয় কালচার নিয়ে আমাদের দেশে খুব মাতামতি চলছে। মহাভারত নাটক হয়েছে, মুভিও হয়েছে, জানেন বোধহয়। তাতে ভারতীয় ঐতিহার একটা নতুন দিক খুলে গেছে।

সো ইউ আর ইনটারেস্টেড ইন ইন্ডিয়ান কালচার?

আই অ্যাম ইনটারেস্টেড ইন দ্যাট কিড।

ইউ মিন—সান অফ আ গোট?

আমি এটাই ভয় পেয়েছিলাম। আমেরিকানরা যে মানুষের বাচ্চাকেও কিড বলে সেটা লালমোহনবাবু জানেন না।

এবার মিঃ বসাক মুখ খুললেন।

ইনি জ্যোতিষ্কর কথা বললেন; মিঃ তরফদারের শো-তে যে ছেলেটি অ্যাপিয়ার করে। উনি ছেলেটি সম্বন্ধে কী জানতে চান সেটা বলবেন কি? বললেন তরফদার। মিঃ বসাক প্রশ্নটা অনুবাদ করে দেওয়াতে কেলারম্যান বললেন, আমি চাই এই আশ্চর্য ছেলেটিকে আমাদের দেশের দর্শকের সামনে হাজির করতে। এর যা ক্ষমতা তা ভারতবর্ষ ছাড়া কোনও দেশে সম্ভব হত না। অবিশ্যি কিছু স্থির করার আগে আমি একবার ছেলেটিকে দেখতে চাই, এবং তার ক্ষমতারও একটু নমুনা পেতে চাই।

বসাক বললেন, মিঃ কেলারম্যান পৃথিবীর তিনজন সবচেয়ে বিখ্যাত ইমপ্রেসারিওর একজন। একুশ বছর ধরে এই কাজ করছেন। ছেলেটিকে পাবার জন্য ইনি অনেক মূল্য দিতে প্রস্তুত। তা ছাড়া টিকিট বিক্রি থেকেও যা আসবে তার একটা অংশও ছেলেটি পাবে। সেটা চুক্তিতে লেখা থাকবে।

তরফদার বললেন, মিঃ কেলারম্যান, দ্য ওয়ান্ডার কিড ইজ পার্ট অফ মাই ম্যাজিক শো। তার আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সামনে আমার দক্ষিণ ভারত টুর আছে। –ম্যাড্রাস দিয়ে শুরু। সেখানে এই ছেলের খবর পৌঁছে গেছে, এবং তারা উদ্গ্রীব হয়ে আছে। এর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখার জন্য। ভেরি সরি, মিঃ কেলারম্যান—আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

কেলারম্যানের মুখ লাল হয়ে গেছে। তাও তিনি ধরা গলায় অনুরোধ করলেন,ছেলেটিকে একবার দেখা যায়? আর সেই সঙ্গে যদি তার ক্ষমতার...?

তাতে অসুবিধে নেই। বললেন তরফদার। তার পর চাকরকে দিয়ে নয়নকে ডেকে পাঠালেন। নয়ন এসে তরফদারের সোফার হাতলে কনুই রেখে দাঁড়াল। দিনের বেলা তাকে এত কাছ থেকে দেখে অদ্ভুত লাগছিল। এমন একটা ক্ষমতা যে ওর মধ্যে আছে সেটা দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই—যদিও চাউনিতে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।

কেলারম্যান অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নয়নের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে, নয়নের দিক থেকে চোখ না। সরিয়ে বললেন, ও কি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর বলে দিতে পারে?

তরফদার বাংলায় নিয়নকে প্রশ্নটি করাতে সে বলল, কোন ব্যাঙ্ক? ওর তো তিনটে ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

কেলারম্যানের মুখ থেকে লাল ভাবটা চলে গিয়ে ফ্যাকাশে ভাব দেখা দিল। সে ঢোক গিলে আগের মতোই ধরা গলায় মার্কিন নাকী উচ্চারণে বলল, সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।

বয়ন গড়গড় করে বলে দিল, ওয়ান টু ওয়ান টু এইট ড্যাশ সেভ্ন ফোর।

জিসাস ক্রাইস্ট!

কেলারম্যানের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আই অ্যাম অফারিং ইউ টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড ডলারস ব্রাইট নাউ। তরফদারের দিকে ফিরে বলেন কেল্যারম্যান। তোমার ম্যাজিক শো থেকে কোনওদিন এত রোজগার করতে পারবে?

এ তো সবে শুরু, মিঃ কেলারম্যান, বললেন তরফদার। এখনও ভারতবর্ষের কত শহর পড়ে আছে; তারপর সারা পৃথিবীর বড় বড় শহর। ম্যাজিক দেখতে ছেলে-বুড়ো সকলেই ভালবাসে। আর এই ছেলেটি যে ম্যাজিক দেখায় তার নমুনা তো দেখলেন। আপনি। এর কোনও তুলনা আছে কি? বিশ হাজার কেন-তারও ঢের বেশি যে এ ছেলে আমার শো থেকে আনবে না, সেটা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে?

ওর বাবা আছেন? জিজ্ঞেস করলেন কেলারম্যান।

ধরে নিন এখন আমিই ওর বাবা।

এর মধ্যে লালমোহন হঠাৎ বলে উঠলেন, স্যার, ইন আওয়ার ফিলজফি, ত্যাগ ইজ মোর ইম্পার্ট্যান্ট দান ভোগ।

কথাটা বসাক কেলারম্যানকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, মিস্টার তরফদার, আপনি কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন না। এমন সুযোগ আপনি আর পাবেন না। ভেবে দেখুন।

বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক যদি নয়নকে কেলারম্যানের হাতে তুলে দিতে পারেন তা হলে তাঁর নিজের নির্ঘাত মোটারকম প্রাপ্তি আছে।

আমার ভাবা হয়ে গেছে, সহজ ভাবে বললেন তরফদার।

অগত্যা কেলারম্যানও উঠে দাঁড়ালেন। বসাক এবার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে তরফদারকে দিয়ে বললেন, এতে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সবই আছে। যদি মাইন্ড চেঞ্জ করেন তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

দুই ভদ্রলোককে দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন তরফদার।

বসাক ঘুঘু লোক। তরফদার ফেরার পরে বলল ফেলুদা, নইলে মার্কিন ইমপ্রেসারিওর এজেন্ট সে হতে পারে না। পয়সার দিক দিয়েও সলিড, হয়তো কেলারম্যানের দৌলতেই। দামি ফরাসি আফটার-শেভ লোশন মেখে এসেছে—যদিও থুতনির নীচে এক চিলতে শেভিং সোপ এখনও লেগে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ঘুম ভঙে দেরিতে, তাই নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।

০৪. পাংচুয়াল হলে

একজনকে তো বিদায় করা গেল, বললেন তরফদার, এবার দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা। পাংচুয়াল হলে তো আর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আসা উচিত।

দু মিনিট অপেক্ষা করতে হল না। নয়নকে ফেরত পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরকে যেতে হল সদর দরজায়। সে ফিরে এল সঙ্গে একটি কালো সুট পরা ভদ্রলোককে নিয়ে। তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গুড মর্নিং। আপনার নামটা টেলিফোনে ঠিক ধরতে পারিনি। আপনি যদি...

তেওয়ারি, সোফায় বসে বললেন ভদ্রলোক, দেবকীনন্দন তেওয়ারি। টি এইচ সিন্ডিকেটের নাম শুনেছেন?

তরফদার, জটায়ু দুজনেই চুপ দেখে ফেলুদাকেই মুখ খুলতে হল।

আপনাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার কি? পোলক স্ট্রিটে অপিস?

ইয়েস স্যার।

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন বলে তরফদার আমাদের বিষয় ওঁকে বলে দিলেন।

এরা আমার তিনজন বিশিষ্ট বন্ধু। আশা করি এঁদের সামনে কথা বলতে আপনার কোনও আপত্তি হবে না।

নো, নো। তবে কথা মানে শুধু একটি প্রশ্ন। ওই ছেলেটিকে যদি একবার আমার সামনে উপস্থিত করেন, তা হলে আমি তাকে কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন করব। জবাব পেলে আমার অশেষ উপকার হবে, আর আমার কাজও শেষ হবে।

দেখিয়ে বললেন, ইনি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন। দেখ। তার উত্তর দিতে পার কি না। তারপর তেওয়ারির দিকে ফিরে বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর সংখ্যায় হবে। তো? অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এ দিতে পারবে না।

আই নো, আই নো। আমি জেনেশুনেই এসেছি।

তারপর—লালমোহনবাবুর ভাষায়—নয়নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে ভদ্রলোক বললেন, আমার সিন্দুকের কম্বিনেশনটা কী সেটা বলতে পার?

নয়ন ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছে দেখে ফেলুদা বলল, শোনো জ্যোতিষ্ক—কম্বিনেশন জিনিসটা কী সেটা বোধহয় তুমি জান না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। একরকম সিন্দুক হয় যাতে তালাচাবি থাকে না। তার বদলে ডালার এক পাশে একটা চাকতি থাকে। যেটাকে ঘোরানো যায়। এই চাকতির গায়ে একটা তীর আঁকা থাকে, আর

চাকৃতিটাকে ঘিরে সিন্দুকের গায়ে এক থেকে শূন্য অবধি নম্বর লেখা থাকে। কম্বিনেশন হল সিন্দুক খালার একটা বিশেষ নম্বর। চাকতিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পর-পর সেই নম্বরের পাশে তীরটাকে আনলে শেষ নম্বরে পৌঁছতেই ঘড়াৎ করে সিন্দুক খুলে যায়—বুঝেছ?

বুঝেছি।

এখানে জটায়ু দুম করে একটা বেশ লাগসই প্রশ্ন করলেন তেওয়ারিকে।

আপনার নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন আপনি নিজেই জানেন না?

তেইশ বছর ধরে জেনে এসেছি, আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন তেওয়ারি। স্বভাবতই মুখস্থ ছিল। ক হাজার বার সে সিন্দুক খুলেছি তার কি হিসাব আছে? কিন্তু বয়স যেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে আমনি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করেছে। আজ চার দিন থেকে নম্বরটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। একটা ডায়রিতে লেখা ছিল, বহু পুরনো ডায়রি—সেটা যে কোথায় গেছে। জানি না। আমি হয়রান হয়ে শেষে এই ছেলের খবর পেয়ে মিস্টার তরফদারের সঙ্গে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করি।

আপনি কি আর-কাউকে কোনওদিন নম্বরটা বলেননি? আবার প্রশ্ন করলেন জটায়ু। ফেলুদার দিকে আড়াচাখে চেয়ে তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম সে জটায়ুকে তারিফ করছে।

তেওয়ারি বললেন, আমার ধারণা আমার পার্টনারকে বলেছিলাম—বহুকাল আগে অবশ্য-কিন্তু সে অস্বীকার করছে। হয়তো এও আমার স্মৃতিভ্রম। কম্বিনেশন তো আর পাঁচজনকে বলে বেড়াবার জিনিস নয়, আর এ-সিন্দুক হল আমার প্যাসোনাল সিন্দুক। আমার যে টাকা ব্যাঙ্কে নেই তা সবই এই সিন্দুকে আছে। অথচ...

তেওয়ারির দৃষ্টি সোফার পাশে দাঁড়ানো নয়নের দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন বলল, সিক্স ফোর থ্রি এইট নাইন সিক্স ওয়ান।

রাইট! রাইট! রাইট! উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তেওয়ারি। আর সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে ডটপেন দিয়ে তাতে নম্বরটা লিখে নিলেন।

আপনার সিন্দুকে কত টাকা আছে সেটা আপনি জানেন? প্রশ্ন করলেন তরফদার।

এগজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা জানি না। বললেন তেওয়ারি, তবে যত দূর মনে হয়—লাখ চারেক তো হবেই।

এ কিন্তু বলে দিতে পারে, নয়নের দিকে দেখিয়ে বললেন তরফদার। আপনি জানতে চান?

তা কৌতুহল তো হয়ই।

তেওয়ারি ঠোঁটের কোণে হাসি আর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে নয়নের দিকে চাইলেন।

টাক্কা-পয়সা কিছু নেই, বলল নয়ন।

হোয়াট!

তেওয়ারি সোফা থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি লাফিয়ে উঠলেন। তারপর উত্তেজনা সামলে নিয়ে মুখে একটা বিরক্ত ভাব এনে বললেন, বোঝাই যাচ্ছে এই বালক সব ব্যাপারে রিলায়েবল নয়। এনিওয়ে, কম্বিনেশনটায় ভুল নেই। ওটা জানতে পেরে সত্যিই আমার উপকার হয়েছে।

তেওয়ারি দাঁড়িয়ে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপি কাগজে মোড়া সরু লম্বা প্যাকেট বার করে নয়নের হাতে দিয়ে বলল, দিস ইজ ফর ইউ, মাই বয়।

তেওয়ারিকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে তরফদার ফিরে আসতে ফেলুদা নয়নকে বলল, ওটা খুলে দেখো তো ওতে কী আছে।

প্যাকেট খুলতে বেরোল একটা ছোটদের রিস্টওয়াচ।

বাঃ! বললেন জটায়ু। এটা পরে ফেলো নয়ন ভাই, পরে ফেলো।

নয়ন ঘড়িটা হাতে পরে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সিন্দুক খুলে তেওয়ারি সাহেবের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, বলল ফেলুদা।

সিন্দুকে যদি সত্যিই কিছু থেকে না থাকে, বললেন জটায়ু, তা হলে তেওয়ারি নিশ্চয়ই ওঁর পার্টনারকেই সন্দেহ করবেন?

ফেলুদা যেন মন থেকে ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। তরফদারের দিকে ফিরে বলল, তোমরা যে দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছ, সেটা কীসে যাবে? ট্রেনে, না প্লেনে?

ট্রেনে অবশ্যই। সঙ্গে এত লটবহার, ট্রেন ছাড়া উপায় কী?

নয়নকে সামলাবার কী ব্যবস্থা করছি?

ট্রেনে তো আমিই সঙ্গে থাকব; কিছু হবে বলে মনে হয় না। ওখানে পৌঁছে আমি ছাড়া একজন আছে যে ওকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখবে। সে হল আমার ম্যানেজার শঙ্কর।

কথা হয়তো আরও চলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে চাকর একটি প্যান্ট-কোট-টাই পরা ভদ্রলোককে এনে হাজির করলেন। বুঝলাম ইনি নাম্বার থ্রি।

গুড মর্নিং। আই মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ—

মি, বললেন তরফদার। মাই নেম ইজ তরফদার।

আই সি। মই নেম ইজ হজসন। হেনরি হজসন।

প্লিজ সিট ডাউন।

তরফদারও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; এবার দুজনেই একসঙ্গে বসলেন।

হজসনের গায়ের যা রং, তাঁকে সাহেব বলা মুশকিল। তাও ইংরিজি ছাড়া গতি নেই।

এঁরা কারা প্রশ্ন করতে পারি কি? পর পর আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন হজসন।

আমার খুব কাছের লোক। আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন।

হুম।

ভদ্রলোকের মেজাজ যে তিরিক্ষি, সেটা তাঁর পামানেন্টলি কুঁচকে থাকা ভুরু থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

আমার এক পরিচিত বাঙালি ভদ্রলোক লাস্ট সানডে তোমার ম্যাজিক দেখেছিল। সে একটি ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলে। আমি অবিশ্যি তার কথা বিশ্বাস করিনি। আমি ঈশ্বর মানি না; তাই অলৌকিক শক্তিতেও আমার বিশ্বাস নেই। ইফ ইউ ব্রিং দ্যাট বয় হিয়ার—আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

তরফদার যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাকরকে ডেকে পাঠালেন।

নারায়ণ, আরেকবার যাও তো—খোকাবাবুকে ডেকে আনো।

নয়ন মিনিট খানেকের মধ্যে হাজির।

সো দিস ইজ দ্য বয়?

হজসন নয়নের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমাদের এখানে ঘোড়দৌড় হয় তুমি জান?

তরফদার সেটা বাংলা করে নয়নকে বললেন।

জানি, পরিষ্কার গলায় বলল নয়ন।

গত শনিবার রেস ছিল, বলল। হজসন। তিন নম্বর রেসে কত নম্বর ঘোড়া জিতেছিল, বলতে পার?

এটাও অনুবাদ হল নয়নের জন্য।

ফাইভ-এক মুহূর্ত না ভেবে বলে দিল নয়ন।

এক জবাবেই কেল্লা ফতে। সোফা থেকে উঠে প্যান্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ বলে এপাশ ওপাশ পায়চারি করতে লাগলেন। হজসন সাহেব। তারপর হঠাৎ থেমে তরফদারের দিকে সোজা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, অল আই ওয়ান্ট ইজ দিস—আমি সপ্তাহে একবার করে এখানে এসে এর কাছ থেকে জেনে যাব সামনের শনিবার কোন রেসে কত নম্বর ঘোড়া জিতবে। সোজা কথায় বলছি—রেস আমার নেশা। অনেক টাকা খুইয়েছি, তাও নেশা যায়নি। কিন্তু আর হারলে দেনার দায়ে আমাকে জেলে পুরবে। তাই এবার থেকে শিওর হয়ে বেট করতে চাই। দিস বয় উইল হেলপ মি।

হাউ ক্যান ইউ বি সো শিওর? ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তরফদার।

হি মাস্ট, হি মাস্ট, হি মাস্ট! বাঁ হাতের তেলের ওপর ডান হাত দিয়ে পর পর তিনটে ঘুষি মেরে বললেন। হজসন সাহেব।

নো-হি মাস্ট নট, দৃঢ়স্বরে বললেন তরফদার। অসাধু উদ্দেশ্যে কোনওরকমে ব্যবহার করা চলবে না। এই বালকের ক্ষমতা! এ ব্যাপারে আমার কথার এক চুল নড়াচড় হবে না।

এবারে হজসনের চেহারা হয়ে গেল ভিখিরির মতো। হাত দুটো জোড় করে ভদ্রলোক কাতর সুরে বললেন, অন্তত আগামী রেসের উইনারের নামগুলো বলে দিক! প্লিজ।

না হেল্প ফর গ্যাম্বলারুস, না হেলপ ফর গ্যাম্বলারস্! আশ্চর্য শুদ্ধ ইংরেজিতে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু।

হজসন সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন, তাঁর মুখ বেগুনি।

তোমাদের মতো এমন চ্যাঁটা আর মুর্খ লোক আমি আর দেখিনি, ড্যাম ইট!

কথাটা বলে আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে হজসন গটগটিয়ে সদর দরজার দিকে চলে গেলেন।

বিশ্রী লোক! হরিবল ম্যান! নাক কুঁচকে চাপা গলায় বললেন জটায়ু।

তরফদার নিয়নকে ঘিরে পাঠিয়ে দিলেন।

বিচিত্র সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বলল ফেলুদা। হজসন অবিশ্যি শুধু জুয়াড়ি নন, তিনি নেশাও করেন। আমি কাছে বসেছিলাম। তাই গন্ধটা সহজেই পাচ্ছিলাম। ওঁর যে দৈন্যদশা সেটা ওঁর কোটের আস্তিনের কনুই দেখলেই বোঝা যায়। ভাঁজ খেয়ে খেয়ে কোটের ওইখানটাই সবচেয়ে আগে জখম হয়। একে তাপ্পি লাগাতে হয়েছে, কিন্তু নতুন কাপড়ের সঙ্গে পুরনো রং বা কোয়ালিটি কোনওটাই মেলেনি। তা ছাড়া ভদ্রলোককে যে বাসে বা ট্রামে আসতে হয়েছে সেটা ওঁর ডান পায়ের কালো জুতোর ডগায় অন্য কারুর জুতোর আংশিক ছাপ দেখেই বোঝা যায়। এ জিনিস ট্যাক্সি বা মেট্রোতে হয় না।

এগুলো অবিশ্যি শুধু ফেলুদারই চোখে ধরা পড়েছে।

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে আমরা আবার টান হয়ে বসলাম।

নাম্বার ফোর, বলল ফেলুদা।

০৫. অদ্ভুত প্রাণী

মিনিট খানেক পরেই নারায়ণ এক অদ্ভুত প্রাণীকে এনে হাজির করল। পুরনা জুতোর বুরুশের মতা দাড়ি, শুয়াপোকার মতো গোঁফ। ঝুলঝাড়ুর মতা চুল, পরনে টিলে হয়ে যাওয়া গেরুয়া সুট, আর বিশ্রীভাবে প্যাঁচ দেওয়া সবুজ টাই। ছাটখাটা মানুষ। বয়স ষাট-পয়ষট্টি হবে, যদিও সেই তুলনায় চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখে মিহি। অথচ কর্কশ গলায় বললেন, তরফদার, তরফদার-হুইচ ওয়ান ইজ তরফদার?

তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আমিই সুনীল তরফদার।

অ্যান্ড দিজ থ্রি? আমাদের তিনজনের উপর দিয়ে একটা ঝাড়-দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

আমার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু, বললেন তরফদার।

নেমস? নেমস?

ইনি প্রদোষ মিত্র, ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, আর ইনি তপেশ মিত্র।

অল রাইট। এবার কাজের কথা। কাজের কথা।

বলুন।

আমার নাম জানেন?

আপনি তো টেলিফোনে শুধু আপনার পদবিটাই বলেছিলেন—ঠাকুর। সেটাই জানি।

তারকনাথ। তারকনাথ ঠাকুর। টি এন টি-ট্রাইনাইট্রোটালুঈন-হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভদ্রলোকের হাসির দমকে চমকে উঠলাম। ট্রাইনাইট্রোটালুঈন বা টি এন টি যে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরকের উপাদান, সেটা আমি জানতাম।

আপনার বাড়িতে কি একজন অসম্ভব বেঁটে বামন থাকে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

কিচোমা। কোরিয়ান, বললেন তারকনাথ। এইট্টি টু সেন্টিমিটারস। বিশ্বের খর্বতম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি।

এ খবরটা মাস কয়েক আগে কাগজে বেরিয়েছিল।

এবার গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পাবে।

একে আপনি জোগাড় করলেন কী করে? প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। আমার অঢেল টাকা। এক পয়সা নিজে উপার্জন করিনি, সব বাপের টাকা। উইল করেননি, তবে আমিই একমাত্র সন্তান, তাই সব টাকাই আমি পাই। কীসের টাকা জান? গন্ধদ্রব্য। পারফিউম। কুন্তলায়নের নাম শুনেছি?

সে তো এখনও পাওয়া যায়, বললেন জটায়ু।

হ্যাঁ। বাবারই আবিষ্কার, ব্যবসাও বাবারই! এখন এক ভাইপো দেখে। আমার কোনও ইনটারেস্ট নেই। আমি সংগ্রাহক।

কী সংগ্রহ করেন?

নানান মহাদেশের এমন সব জিনিস যার জুড়ি নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম; কিচামোর কথা বললাম। এ ছাড়া আছে দুহাতে একসঙ্গে লিখতে পারে এমন একটি সেক্রেটারি। জাতে মাওরি। নাম টোকোবাহানি। আরও আছে। একটি ব্ল্যাক প্যারট-তিন ভাষায় কথা বলে। একটি দুই-মাথা বিশিষ্ট পমেরেনিয়ান কুকুর, লছমনকুলার একটি সাধু উড্ডীনানন্দ, মাটি থেকে দেড় হাত উপরে শূন্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ধ্যান করে। তা ছাড়া–

ওয়ান মিনিট স্যার, বলে। লালমোহনবাবু বাধা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হল! হাতের লাঠি মাথার উপর তুলে চোখ রক্তবর্ণ করে তারকনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, ইউ ডেয়ার ইনটারপ্ট মি?

সরি সরি সরি স্যার। জটায়ু কুঁকড়ে, গেছেন–আমি জানতে চাইছিলুম। আপনার সংগ্রহের মধ্যে যারা মানুষ, তারা কি স্বেচ্ছায় আপনার ওখানে রয়েছে?

তারা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল বেতন পায়, আরাম পায়, আদর পায়–থাকবে না। কেন? হোয়াই নট? আমার কথা আর আমার সংগ্রহের কথা পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোকেই জানে; তোমরা না জানতে পার। আমেরিকা থেকে একজন সাংবাদিক এসে আমার সঙ্গে কথা বলে, দেশে ফিরে নিউ ইয়র্ক টাইমসে দ্য হাউস অফ ট্যারক বলে এক প্রবন্ধ লেখে।

এবার তরফদার মুখ খুললেন।

অনেক কথাই তো জানা গেল, কেবল আপনার এখানে আসার কারণটা ছাড়া।

এটা আবার বলে দিতে হবে? আমি ওই খোকাকে আমার সংগ্রহের জন্য চাই। কী নাম যেন? ইয়েস-জ্যোতিষ্ক। আই ওয়ন্ট জ্যোতিষ্ক।

কেন? সে তো এখানে দিব্যি আছে, বললেন তরফদার। খাওয়া পরার অভাব নেই, যত্ন অ্যাত্তির অভাব নেই। সে আমার ডেরা ছেড়ে আপনার ওই উদ্ভট ভিড়ের মধ্যে যাবে। কেন?

তারকনাথ তরফদারের দিকে প্রায় আধ মিনিট চেয়ে থেকে বললেন, গাওয়াঙ্গি-কে একবার দেখলে তুমি এমন বেপরোয়া কথা বলতে পারতে না।

হোয়াট ইজ গাওয়াঙ্গি? প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

নট হোয়াট, বাট হু, গম্ভীরভাবে বললেন তারকনাথ। নট বস্তু, বাট ব্যক্তি! ইউগ্যান্ডার লোক। পৌনে আট ফুট হাইট, চুয়ান্ন ইঞ্চি ছাতি, সাড়ে তিনশো কিলো ওজন। কোনও ওলিম্পিক ওয়েট লিফটার ওর কাছে পাত্তা পাবে না। একবার টেরাইরের জঙ্গলে একটা বাঘকে ঘুমপাড়ানি ইনজেকশনের গুলি মারে, কারণ বাঘটার গায়ে স্পট এবং ডোরা দুই-ই ছিল। একমেবাদ্বিতীয়ম। সেই বাঘকে কাঁধে করে সাড়ে তিন মাইল বয়ে এনেছিল গাওয়াঙ্গি। সে এখন আমার একনিষ্ঠ সেবক।

আপনি কি আবার দাসপ্রথা চালু করলেন নাকি? জটায়ু বেশ সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

নো স্যার! গর্জিয়ে উঠলেন টি এন টি। গাওয়াঙ্গিকে যখন দেখি তখন তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইউগ্যান্ডার রাজধানী কম্পালা শহরে এক শিক্ষিত পরিবারের ছেলে! বাপ ডাক্তণর। তাঁর কাছেই শুনি গাওয়াঙ্গির যখন চোদ্দ বছর বয়স তখনই সে প্রায় সাত ফুট লম্বা। বাড়ির বাইরে বেরোয় না। কারণ রাস্তার লোকে ঢিল মারে। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ছাত্রদের বিদ্রুপের ঠেলায় বাধ্য হয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স একুশ। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চুপচাপ ঘরে বসে থাকে সারাদিন। দেখে মনে হল এইভাবে সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। সেই অবস্থা থেকে তাকে আমি উদ্ধার করে আনি। আমার কাছে এসে সে নতুন জীবন পায়। সে আমার দাস হতে যাবে। কেন? আমি তাকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করি। আমাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

যাই হোক তারকবাবু, বললেন তরফদার, আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমি জ্যোতিষ্ককে চিড়িয়াখানার অধিবাসী হিসেবে কল্পনা করতে পারি না এবং চাইও না।

গাওয়াঙ্গির বিবরণ শোনার পরেও এটা বলছ?

বলছি।

ভদ্রলোক যেন একটু দমে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই যখন বলছি তখন এই ছেলেটিকে একবার দেখতে পারি কি?

সেটা সহজ ব্যাপার। আপনি সেই কলকাতার উত্তর প্রান্ত থেকে এসেছেন, আপনার জন্য এতটুকু করতে পারব না?

নয়ন এসে দাঁড়াতে তারকাবাবু তার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার বাড়িতে কটা ঘর আছে বলতে পার?

ছেষট্টি

হুঁ...

এবার তারকনাথ উঠে দাঁড়িয়ে তার লাঠির রুপো দিয়ে বাঁধানো মাথাটা ডান হাতের মুঠো দিয়ে শক্ত করে ধরে বললেন, রিমেমবার, তরফদার-টি এন টি অত সহজে হার মানে না। আমি আসি।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ কোনও কথাই বললাম না। নয়নকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন তরফদার। অবশেষে লালমোহনবাবু ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, চার দিয়ে তো অনেক কিছু হয়—না মশাই? চতুর্দিক, চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ, চতুর্বেদ-এই চারটিকে কী বলব। তাই ভাবছি।

চতুর্লোভী বলতে পারেন। বলল ফেলুদা। চার জনই যে লোভী তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তবে লোভী হয়েও যে কোনও লাভ হল না সে ব্যাপারে সুনীলকে তারিফ করতে হয়।

তারিফ কোন স্যার? বললেন তরফদার। এ তো সোজা অঙ্ক। সে ছেলে আমার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সুস্থ পরিবেশে। আমি তাকে দেখছি। সে আমাকে দেখছে। স্রেফ লেনদেনের ব্যাপার। এ অবস্থার পরিবর্তন হবে কেন?

আমরা তিনজন উঠে পড়লাম।

একটা কথা বলি তোমাকে, তরফদারের কাঁধে হাত রেখে বলল ফেলুদা, আর অ্যাপায়েন্টমেন্ট না।

পাগল! বললেন তরফদার। এক দিনেই যা অভিজ্ঞতা হল, এর পরে আবার অ্যাপায়েন্টমেন্ট!

তবে এটা বলে রাখি। –নয়নকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে যদি আমার প্রয়োজন হয়, তা হলে আমি তৈরি আছি। ছেলেটির উপর আমার মায়া পড়ে গেছে।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। প্রয়োজন হলেই খবর পাবেন।

০৬. বিষ্যুদবারের সকাল

বিষ্যুদবারের সকাল। গতকালই চতুর্লোভীর সঙ্গে সকলে কাটিয়েছি। আমরা! বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ক্রমে এক্সাইটিং হয়ে আসছে, তাই বোধহয় জটায়ু তাঁর অভ্যাসমতো নটায় না এসে সাড়ে আটটায় এসেছেন।

কোন কাগজ?

স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার...

মশাই, এক কাশ্মীরি শালওয়ালা এসে সকলটা এক্কেবারে মাটি করে দিয়ে গেল।

কাগজ-টাগজ কিছু দেখা হয়নি। কী খবর মশাই?

আমি আগেই কাগজ পড়েছি, তাই খবরটা জানতাম।

তেওয়ারি সিন্দুক খুলেছিলেন, বলল ফেলুদা, আর খুলে দেখেন সত্যিই তার মধ্যে একটি কপর্দকও নেই।

তা হলে তো নয়ন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড় বড় করে বললেন জটায়ু। চুরিটা কখন হয়?

দুপুরে আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে। অন্তত তেওয়ারির তাই ধারণা! সেই সময়টা তিনি আপিসে ছিলেন না। ছিলেন তাঁর ডেনটিস্টের চেম্বারে। ভদ্রলোকের স্মরণশক্তি এখন ভাল কাজ করছে। দুদিন আগেই নাকি উনি সিন্দুক খুলেছিলেন, তখন সব কিছুই ছিল। টাকার অঙ্কও মনে পড়েছে-পাঁচ লাখের কিছু উপরে। তেওয়ারি অবিশ্যি তাঁর পার্টনারকেই সন্দেহ করছেন। বলছেন একমাত্র তাঁর পার্টনারই নাকি 6 জানত; এ ছাড়া আর কাউকে কখনও বলেননি।

এই পার্টনারটি কে?

নাম হিঙ্গোয়ানি। টি এইচ সিণ্ডিকেটের টি হলেন তেওয়ারি। আর এইচ হিঙ্গোয়ানি।

যাকগে। তেওয়ারি, হিংটিংছাট, এ সবে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি খালি ভাবছি। ওই পুঁচকে ছেলে এমন ক্ষমতা পেল কী করে?

আমিও সে কথা অনেকবার ভেবেছি। ব্যাপারটা প্রথম কী করে আবিষ্কার হয়, সেটা জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে। তোপ্‌সে, নয়নের বাড়ির রাস্তার নাম তোর মনে আছে?

নিকুঞ্জবিহারী লেন। কালীঘাট।

গুড।

একবার যাবেন নাকি মশাই? বলা যায় না, আমার ড্রাইভার কলকাতার এমন সব রাস্তা চেনে যার নামও আমি কস্মিনকালে শুনিনি।

সত্যিই দেখা গেল হরিপদবাবু নিকুঞ্জবিহারী লেন চেনেন। বললেন, ও রাস্তায় তো পলুন্টু দত্ত থাকতেন। আমি তখন অজিতেশ সাহার গাড়ি চালাই। একদিন তাঁকে নিয়ে গেলুম। পটু দত্তর বাড়ি। দুজনেই তো ফুটবলার, তাই খুব আলাপ।

দশ মিনিটের মধ্যে নিকুঞ্জবিহারী লেন-এ পৌঁছে একটা পানের দোকানে জিজ্ঞেস করে। জানলাম। অন্নসীম সরকার থাকেন আট নম্বরে।

আট নম্বরের দরজায় টাকা দিতে একজন রোগা, ফরাসী ভদ্রলোক দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বুঝলাম তিনি সবেমাত্র দাড়ি কামানো শেষ করেছেন, কারণ হাতের গামছা দিয়ে গাল মোছা এখনও শেষ হয়নি।

আপনারা–? ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

আপনি কি আপিসে বেরোচ্ছেন?

আজ্ঞে না। এখন তো ৯টা। আমি বেরোই সাড়ে ৯টায়।

ফেলুদা বলল, আমরা গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার ছেলের-আপনিই তো অসীম সরকার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা আপনার ছেলের। তরফদারের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাল আলাপ হয়েছে। তাঁর কাছেই আপনার বাড়ির হদিস পেলাম। –এই দেখুন, আমরা কে তাই বলা হয়নি। । -ইনি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক জটায়ু, এ আমার ভাই তপেশ, আর আমি প্রদোষ মিত্র।

প্রদোষ মিত্র? ভদ্রলোকের চোখ কপালে। সেই বিখ্যাত গায়েন্দা প্রদোষ মিত্র-যার ডাক নাম ফেলু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ফেলুদা বিনয়ের অবতার।

ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন-কী আশ্চর্য!

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন ভিতরে গিয়ে একটা সরু প্যাসেজের বা দিকের দরজা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেটাকে শোবার ঘর বসবার ঘর দুই-ই বলা চলে। দুটো চেয়ার আর একটা তক্তপোশ ছাড়া ঘরে

কোনও আসবাব নেই। তক্তপোশের এক প্রান্তে শতরঞ্চি দিয়ে গোটানো একটা বালিশ দেখে বোঝা যায়, সেখানে কেউ শোয়। ফেলুদা আর জটায়ু চেয়ারে, অসীম বাবু আর আমি খাটে বসলাম।

ফেলুদা বলল, আপনার বেশি সময় নেব না। আমাদের আসার কারণটা বলি। সে দিন তরফদারের শো-তে আপনার ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শোয়ের পর তরফদারকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলেন ছেলেটি তাঁর কাছেই থাকে। আমি জানতে চাই যে নয়নের বাসস্থান পরিবর্তনের প্রস্তাবটা কি তরফদার করেন, না। আপনি করেন?

আপনি মহামান্য ব্যক্তি, আপনার কাছে মিথ্যা বলব না। ওঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবটা তরফদার মশাই-ই করেন, তবে তার আগে নয়নকে আমিই ওঁর কাছে নিয়ে যাই।

সেটা কবে?

ওর ক্ষমতা প্রকাশ পাবার তিন দিন পরে। –দোসরা ডিসেম্বর।

এই সিদ্ধান্তের কারণটা কী?

এর একটাই কারণ, মিত্তির মশাই! আমার বাড়ি দেখেই বুঝতে পারছেন আমার টানাটনির সংসার। আমার চারটি সন্তান। বড়টি ছেলে, সে বি কম পড়ছে। তার খরচ আমাকে জোগাতে হয়। তারপর দুটি মেয়ে। তাদেরও স্কুলের খরচ আছে। নয়নকে এখনও ইস্কুলে দিইনি। আমি এই কালীঘাট পোস্ট আপিসেই সামান্য চাকরি করি। পুঁজি বলতে কিছুই নেই; যা আনি তা নিমেষেই খরচ হয়ে যায়; ভবিষ্যতের কথা ভেবে গা-টা বারবার শিউরে ওঠে। তাই নয়নের মধ্যে যখন হঠাৎ এই ক্ষমতা প্রকাশ পেল, তখন মনে হল—একে দিয়ে কি দু পয়সা উপার্জন করানো যায় না? কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে কিন্তু আমার যা অবস্থা, তাতে এমন ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়, মিত্তির মশাই।

সেটা আমি বুঝতে পারছি, বলল ফেলুদা। এর পরেই আপনি নয়নকে তরফদারের কাছে নিয়ে যান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার তো টেলিফোন নেই, তাই আর অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করতে পারিনি, সোজা চলে যাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রলোক নয়নের ক্ষমতার দু-একটা নমুনা দেখতে চাইলেন। আমি বললুম, ওকে এমন কিছু জিজ্ঞেস করুন, যার উত্তর নম্বরে হয়। ভদ্রলোক নয়নকে বললেন, আমার বয়স কত বলতে পার? নয়ন তক্ষুনি জবাব দিল–তেত্রিশ বছর তিন মাস দশ দিন। এর পরে আর কোনও প্রশ্ন করেননি তরফদার; আমাকে বললেন–আমি যদি ওকে মঞ্চে ব্যবহার করি, তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে? আমি অবশ্যই পারিশ্রমিক দেব। –আমি রাজি হয়ে গেলুম। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন-আপনি কত আশা করেন? আমি ভয়ে ভায়ে বললাম–মাসে এক হাজার। তরফদার বললেন, ভুল হল। আমার মাথায় কী নম্বর আছে, বলে তো, নয়ন? নয়ন বলল—তিন শূন্য শূন্য শূন্য। —সে ভুল বলেনি, মিত্তির মশাই। তরফদার মশাইও তাঁর কথা রেখেছেন। আগাম তিন হাজার আমি এরই মধ্যে

পেয়ে গেছি। আর ভদ্রলোক যখন আমাকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিলেন, তখন নয়নকে তাঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবেই বা কী করে না বলি?

কিন্তু নয়ন কি স্বেচ্ছায় গেল?

সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এখন তো ও দিব্যি আছে।

এইবারে আরেকটা প্রশ্ন করছি, বলল ফেলুদা, তা হলেই আমাদের কাজ শেষ।

বলুন।

ওর ক্ষমতার প্রথম পরিচয় আপনি কী করে পেলেন?

খুব সহজ ব্যাপার। একদিন সকালে উঠে নয়ন বলল—বাবা, আমার চোখের সামনে অনেক কিছু গিজগিজ করছে। তুমি সেরকম দেখছি না? আমি বললাম, কই, না তো। কী গিজ গিজ করছে? নয়ন বলল, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য। সব এ দিকে ও দিকে ঘুরছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। আমার মনে হয় আমাকে যদি নম্বর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো তা হলে ওদের ছটফটানি থামবে। —আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাও ছেলের অনুরোধ রাখতে জিজ্ঞেস করলাম, আমার একটা খুব মোটা লাল বাঁধানো বাংলা বই আছে জানি তো? নয়ন বলল, মহাভারত? আমি বললাম, হ্যাঁ। সেই বইয়ে কত পাতা আছে বলে তো। নয়নের মুখে হাসি ফুটল। বলল, ছটফটানি থেমে গেছে। সব নম্বর পালিয়ে গেছে। খালি তিনটে নম্বর পর পর দাঁড়িয়ে আছে। কী নম্বর জিজ্ঞেস করতে নয়ন বলল, নয় তিন চার। আমি তাক থেকে কালী সিংহের মহাভারত নামিয়ে খুলে দেখি তার পৃষ্ঠা সংখ্যা সত্যি ৯৩৪।

আমাদের কাজ শেষ, আমরা ভদ্রলোককে বেশ ভাল রকম ধন্যবাদ দিয়ে বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

শ্রীনাথ দরজা খুলে দিতে বসবার ঘরে ঢুকেই দেখি দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তার মধ্যে সুনীল তরফদারকে চিনি। অন্যজনকে আগে দেখিনি।

ফেলুদা ব্যস্তভাবে বলল, সরি। তোমরা কি অনেকক্ষণ এসেছ?

পাঁচ মিনিট, বললেন তরফদার। এ হচ্ছে আমার ম্যানেজার ও প্রধান সহকারী—শঙ্কর হুবলিকার।

আপনি তো মারাঠি? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

ইয়েস স্যার। তবে আমার জন্ম, স্কুলিং, সবই এখানে।

বসুন, বসুন।

আমরা সবাই বসলাম।

কী ব্যাপার বলে? তরফদারকে উদ্দেশ করে বলল ফেলুদা।

ব্যাপার গুরুতর।

মানে?

কাল আমাদের বাড়িতে দৈত্যের আগমন হয়েছিল।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেই গাওয়াঙ্গির কথা বলছেন নাকি ভদ্রলোক?

ব্যাপারটা খুলে বলো, বলল ফেলুদা।

বলছি। বললেন ভদ্রলোক। আজি ঘুম থেকে উঠে বাদশাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোব—তখন সাড়ে পাঁচটা—দোতলা থেকে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কেন?

সিঁড়ির সামনের মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। রক্ত, আর সেই রক্ত থেকে পায়ের ছাপ সদর দরজার দিকে চলে গেছে। সেই ছাপ পরে মেপে দেখেছি-লম্বায় ষোল ইঞ্চি।

ষো...! লালমোহনবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

তারপর? বলল ফেলুদা।

তরফদার বলে চললেন, আমাদের দরজায় কেল্যাপসিবল গেট লাগানো। রাত্তিরে সে গেট তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। সেই গেট দেখি অর্ধেক খোলা, আর তালা ভাঙা। সেই আধাখোলা গেটের বাইরে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আমার দারোয়ান ভগীরথ। ভগীরথের পাশ দিয়ে আরও রক্তাক্ত পায়ের ছাপ চলে গেছে পাঁচিলের দিকে।

জলের ঝাপটা দিয়ে তো কোনওরকমে ভগীরথের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। সে চোখ খুলেই দানো!! দানো! বলে আর্তনাদ করে আবার ভিরমি যায়। আর কী! যাই হোক, তার কাছ থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে এই-মাঝরাত্তিরে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে খাইনি ডলছিল। দরজার বাইরে একটা লো পাওয়ারের বাতি সারারাত জ্বলে। এই আবছা আলোয় ভগীরথ হঠাৎ দেখে যে একটা অতিকায় প্রাণী পাঁচিলের দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণীটা যে পাঁচিল টপকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ গোটে রয়েছে। সশস্ত্র প্রহরী।

ভগীরথ বলে সে একবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল; সেখানে গরৈলা বলে একটা জানোয়ার দেখে। এই প্রাণীর চেহারা কতকটা সেইরকম, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি লম্বা আর চওড়া। এর বেশি ভগীরথ আর কিছু বলতে পারেনি, কারণ তার পরেই সে সংজ্ঞা হারায়।

বুঝেছি, বলল ফেলুদা! দানোটা তারপর কোলাপসিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকে, আর তখনই তোমার বিশ্বস্ত বাদশা দানোটার প্যায়ে কামড় দিয়ে তাকে জখম করে। এবং তার ফলেই দানব তার কাজ অসমাপ্ত রেখে পলায়ন করে।

কিন্তু যাবার আগে সে প্রতিশোধ নিয়ে যায়। বাদশার ঘাড় মটকানো মৃতদেহ পড়ে ছিল সদর দরজা থেকে ত্রিশ হাত দূরে-তার মুখের দুপাশে তখনও রক্ত লাগা।

আমি মনে মনে বললাম-এই ঘটনায় যদি খুশি হবার কোনও কারণ থাকে সেটা এই যে টি.এন.টি.-র উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি।

ফেলুদা চিন্তিতভাবে চুপ করে আছে দেখে তরফদার অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, কিছু বলুন, মিস্টার মিত্তির?

বলার সময় পেরিয়ে গেছে সুনীল, গভীর স্বরে বলল ফেলুদা। এখন করার সময়।

কী করার কথা ভাবছেন?

ভাবছি না, স্থির করে ফেলেছি।

কী?

দক্ষিণ ভারত যাব। ম্যাড্রাস দিয়ে শুরু। নয়ন ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। তার যাতে অনিষ্ট না হয় এটা দেখার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখানে প্রদোষ মিত্রকে প্রয়োজন।

তরফদারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আপনি যে আমাকে কতটা নিশ্চিন্ত করলেন, তা বলতে পারব না। আপনি অবশ্য আপনার প্রোফেশনাল ক্যাপাসিটিতে কাজ করবেন, আপনার পরিশ্রমিক আর আপনাদের তিনজনের যাতায়াত ও হোটেল খরচা আমি দেব। আমি মানে—আমার পৃষ্ঠপোষক।

খরচের কথা পরে। তোমাদের যাওয়ার তারিখ তো উনিশে ডিসেম্বর, কিন্তু কোন ট্রেন সেটা জানি না।

করোমণ্ডল এক্সপ্রেস।
আমার হোটেল?
সেও হুকরোমণ্ডল।
বুঝেছি। তাজ করোমণ্ডল। তাই তো?

হ্যাঁ, আর আপনারা কিন্তু ফাস্ট ক্লাস এ.সি.-তে যাচ্ছেন। এখনই আপনাদের নাম আর বয়স একটা কাগজে লিখে দিন; বাকি কাজ সব শঙ্কর করে দেবে।

ফেলুদা বলল, বুকিং-এ অসুবিধা হলে আমাকে জানিও। রেলওয়েতে আমার প্রচুর জানাশোনা।

০৭. তরফদাররা গেলেন

তরফদাররা গেলেন পৌনে দশটায়, তারপর ঠিক পাঁচ মিনিট বাদেই ফেলুদার একটা ফোন এল, সেটা যাকে বলে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কথা-টথা বলে সোফায় বসে শ্রীনাথের সদ্য আনা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, কাল ডিরেক্টরি খুলে দেখেছি, এই নামে শুধু দুটো ফোন আছে।

এই সব সামান্য ব্যাপারে আপনার সাসপেন্স তৈরি করার প্রবণতাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না, মশাই, বললেন জটায়ু। কার ফোন সেটা হেঁয়ালি না করে বলবেন?

হিঙ্গোয়ানি।

যার কথা কাগজে বেরিয়েছে?

ইয়েস স্যার। তেওয়ারির পার্টনার।

এই ব্যক্তির কী দরকার। আপনার সঙ্গে?

সেটা ওঁর ওখানে গেলে বোঝা যাবে। ভদ্রলোক বললেন কর্নেল দালালের কাছে আমার প্রশংসা শুনেছেন।

ও, গত বছরের সেই জালিয়াতির মামলাটা।

হ্যাঁ।

অ্যাপায়েন্টমেন্ট হয়েছে?

সেটা আমার কথা থেকেই আপনার বোঝা উচিত ছিল; আপনি মনোযোগ দেননি।

আমি কিন্তু বুঝেছিলাম ফেলুদার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায়। সেটা লালমোহনবাবুকে বলতে উনি বেশ রেগে গিয়ে বললেন, কানের কাছে অন্যে টেলিফোন করলে আমি অন প্রিনসিপল তার কথা শুনি না। কোথায় থাকেন। ভদ্রলোক?

আলিপুর পার্ক রোড।

বনেদি পাড়া।

—আমরাও যাচ্ছি। তো আপনার সঙ্গে?

সেটা কবে যাননি বলতে পারেন?

ঠিক কথা। ইয়ে-আনি দিয়ে পদবি শেষ হলে তো সিন্ধি বোঝায়, তাই না?

তা তো বটেই। দেখুন না—দু আনি ছি আনি কেরানি কাঁপানি হাঁপানি চাকরানি মেথরানি...

রক্ষে করুন, রক্ষে করুন! দু হাত তুলে বললেন জটায়ু। বাপরে!—এ হচ্ছে আপনার সজারু-মজারু মুড়। আমার খুব চেনা। কিছু জিজ্ঞেস করলেই টিটকিরির খোঁচা। যাই হোক-যেটা বলতে চাইছিলাম-ভাবছি আজ দ্বিপ্রহরের আহারটা এখানেই সারব। খিচুড়ির আইডিয়াটা কেমন লাগে? বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়েছে তো?

উত্তম প্রস্তাব, বলল ফেলুদা।

দুপুরে খাবার পর ফেলুদা দু ঘণ্টা ধরে জটায়ুকে স্ক্র্যাকূল খেলা শেখাল। ভদ্রলোক কোনও দিন ক্রসওয়ার্ডই করেননি। তাই ওঁকে-সিন্ধি নামের ঢঙেই বুলি। –বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হল। ফেলুদা শব্দের খেলাতে একেবারে মাস্টার, যেমন হেঁয়ালির জট ছাড়াতেও মাস্টার-যার অনেক উদাহরণ এর আগে দিয়েছি।

আলিপুর পার্ক রোড অবশ্যই হরিপদবাবুর চেনা। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমাদের গাড়ি সাঁইত্রিশ নম্বরের গেট দিয়ে ঢুকে পোর্টিকের নীচে এসে থামল। সামনেই ডাইনে গ্যারেজ, তার বাইরে একটা লম্বা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশি বলে মনে হচ্ছে? লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, না। ওটার নাম কনটেসা। এখানেই তৈরি।

সদর দরজায় দারোয়ান দাঁড়িয়ে, ফেলুদা তাকে বলল, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ইতিমধ্যে বোধহয় গাড়ির শব্দ পেয়েই একটি বেয়ারা এসে হাজির হয়েছে; সে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, মিত্তর সাব?

হাম নেহি-ইনি, ফেলুদার দিকে দেখিয়ে বললেন জটায়ু।

আইয়ে আপ লোগ।

বেয়ারার পিছন পিছন আমরা একটা ড্রইং রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

বৈঠিয়ে।

আমি আর জটায়ু একটা সোফায় বসলাম! ফেলুদা তৎক্ষণাৎ না বসে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে একটা বুক সেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; দেওয়ালে আর টেবিলে শোভা পাচ্ছে এমন খুঁটিনাটির মধ্যে অনেক নেপালি জিনিস রয়েছে। লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, দার্জিলিং।

কেন, দার্জিলিং কেন? ফিরে এসে আরেকটা সোফায় বসে বলল ফেলুদা। নেপালি জিনিস কি নেপালে পাওয়া যায় না?

আরো সে তো নিউ মার্কেটেই পাওয়া যায়।

বাইরে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো গ্র্যান্ডফাদার ক্লিক দেখেছি, এবার তাতে গভীর অথচ মোল্যায়েম শব্দে ঢং ঢেং করে পাঁচটা বাজতে শুনলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খয়েরি রঙের সুট পরা একজন রোগা, ফরাসা, প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। কেন জানি মনে হল ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যটা খুব ভাল যাচ্ছে না-বাধহয় চোখের তলায় কালির জন্য।

আমরা তিনজনেই নমস্কার করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, বসুন বসুন-প্লিজ সিট ডাউন।

ভদ্রলোকের ঘড়ির ব্যান্ডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে, কারণ নমস্কার করে হাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা সাড়াৎ করে নীচে নেমে এল। ডান হাত দিয়ে ঠেলে সেটাকে যথাস্থানে এনে ভদ্রলোক ফেলুদার উলটাদিকের সোফায় বসলেন। বাংলা ইংরেজি হিন্দি মিশিয়ে কথা বললেন হিঙ্গেয়ানি।

ফেলুদা নিজের এবং আমাদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেবার পর ভদ্রলোক বললেন, আমার আপিসের যে খবর কাগজে বেরিয়েছে সে কি আপনি পড়েছেন?

পড়েছি, বলল ফেলুদা।

আমি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করি। আমাকে যে ভাবে হ্যাঁরাস করা হচ্ছে তাকে গ্রহের ফের ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমার পার্টনারের ভীমরতি ধরেছে; কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক লোক কখনও এমন করতে পারে না।

আমরা কিন্তু আপনার পার্টনারকে চিনি।

হাউ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন হিঙ্গোয়ানি।

ফেলুদা সংক্ষেপে তরফদার আর জ্যোতিষ্কের ব্যাপারটা বলে বলল, এই ছেলের ব্যাপারেই তেওয়ারি ফোনে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে তরফদারের বাড়ি এসেছিলেন। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভদ্রলোক বললেন তাঁর সিন্দুকের কম্বিনেশনটা ভুলে গেছেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলে দেয়, আর সেই সঙ্গে এটাও বলে যে সিন্দুকে আর একটি পাই-পয়সাও নেই।

আই সি...

আপনি ফোনে বললেন আপনাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে?

তা তো বটেই। প্রথমত, বছর খানেক থেকেই আমাদের মধ্যে বনিব্বনা হচ্ছে না, যদিও এককালে আমরা বন্ধু ছিলাম। আমরা একসঙ্গে এক ক্লাসে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম। কলেজ ছাড়ার বছর খানেকের মধ্যেই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবসা শুরু কবি। তারপর ১৯৭৩-এ আমরা এক জোটে টি এইচ সিন্ডিকেটের পত্তন করি। বেশ ভাল চলছিল কিন্তু ওই যে বললাম–কিছুদিন থেকে দুজনের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল।

সেটার কারণ কী?

প্রধান কারণ হচ্ছে—তেওয়ারির স্মরণশক্তি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। সামান্য জিনিসও মনে রাখতে পারে না। ওকে নিয়ে মিটিং করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত বছর একদিন আমি তেওয়ারিকে বলি-ডাঃ শর্মা বলে একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ মস্তিষ্ক চিকিৎসক আছেন। তাঁকে আমি খুব ভাল করে চিনি; আমি চাই তুমি একবার তাঁর কাছে যাও। –তাতে তেওয়ারি ভয়ানক অফেন্স নেয়। সেই থেকেই আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। অথচ আমি হাল না ধরলে সিন্ডিকেট ডুবে যাবে শুধু এই কথা ভেবেই আমি রয়ে গিয়েছিলাম। না হলে আইনসম্মত ভাবে পার্টির্নারশিপ চুকিয়ে দিয়ে চলে আসতাম। কিন্তু যে ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলাম সেটা এই যে, তেওয়ারি যেই জানতে পারল যে ওর সিন্দুক খালি, ও সটান আমার কাছে এসে বলল, গিভ মি ব্যাক মাই মানি–দিস মিনিট।

উনি যে ক্লেম করেন যে এককালে আপনাকে কম্বিনেশনটা বলেছিলেন, সেটা কি সত্যি?

সর্বৈব মিথ্যা। ওটা ছিল ওর পাসোনাল সিন্দুক। তার কম্বিনেশন ও পাঁচজনকে বলে বেড়াবে? ননসেন্স। তা ছাড়া ওর ধারণা যে ও যখন ডেনটিস্টের কাছে যায়। তখনই আমি ওর সিন্দুক খুলে টাকা চুরি করি। অথচ আমার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে সেই সময়টা আমি ছিলাম আপিস থেকে অন্তত চার মাইল দূরে। আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে খবর পেয়ে আমি এগারেটার সময় কেলভিউ ক্লিনিকে চলে যাই, ফিরি সাড়ে তিনটেয়।

তাও মিঃ তেওয়ারি আপনার পিছনে লেগে আছেন?

শুধু পিছনে লেগেছেন নয় মিস্টার মিটার, তিনি আমাকে শাসিয়েছেন যে অবিলম্বে টাকা ফেরত না দিলে তিনি আমার সর্বনাশ করবেন। তেওয়ারি যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতদূর যেতে পারে তার বেশ কিছু নমুনা আমি গত সতেরো বছরে পেয়েছি। গুণ্ডা লাগিয়ে কী করা সম্ভব-অসম্ভব সে আর আমি আপনাকে কী বলব?

আপনি বলতে চান তেওয়ারি এতই প্রতিহিংসাপরায়ণ যে গুণ্ডা লাগিয়ে আপনাকে খুন করানোতেও সে পেছপা হবে না?

সিন্দুকে কিছু নেই জানার পরমুহূর্তে সে যেভাবে আমার ঘরে এসে আমার উপর দোষারোপ করে, তাতে আমি পরিষ্কার বুঝি যে তার কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এ অবস্থায় টাকা ফেরত না পেলে আমার উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

এই চুরি সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনও থিওরি আছে?

প্রথমত, চুরি যে গেছে সেটাই আমি বিশ্বাস করি না। তেওয়ারি হয় সেটা সরিয়েছে, না হয় কিছুতে খরচ করেছে, না হয় কাউকে দিয়েছে; তোমরা বাংলায় যে বলে না। –ব্যোম ভোলানাথ?—তেওয়ারি হল সেই ভোলানাথ। না হলে বাইশ বছরের পুরনো ব্যক্তিগত সিন্দুদের কম্বিনেশন কেউ ভোলে?

বুঝলাম, বলল ফেলুদা। এবার তা হলে আসল কথায় আসা যাক।

কেন আমি আপনাকে ডেকেছি সেটা জানতে চাইছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেখুন। মিঃ মিটার—আমি চাই প্রোটেকশন। তেওয়ারি নিজে ভোলানাথ হতে পারে, কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাদের কেউই ভোলানাথ নয়। তারা অত্যন্ত সেয়ানা, ধূর্ত, বেপরোয়। এই জাতীয় প্রোটেকশনের কাজ তো আপনাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মধ্যে পড়ে। তাই না?

তা পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, আমি সামনে প্রায় পাঁচ সপ্তাহের জন্য থাকছি। না। ফলে আমার কাজ শুরু করতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাতে আপনার চলবে কি?

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

দক্ষিণ ভারত। প্রথমে ম্যাড্রাস। সেখানে দশ দিন, তারপর অন্যত্র।

হিঙ্গোয়ানির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

এক্সেলেন্ট! হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন ভদ্রলোক। আপনাকে একটা কথা এখনও বলা হয়নি-আমি দুদিন থেকে আর আপিসে যাচ্ছি না। যা ঘটেছে তার পরে আর কোনও মতেই ওখানে থাকা যায় না। আইনত যা করার তা আমি যথাসময়ে করব। –যখন মাথা ঠাণ্ডা হবে। অথচ রোজগার তো করতেই হবে। ম্যাড্রাসে একটা কাজের সম্ভাবনা আছে সে খবর আমি পেয়েছি। আমি এমনিতেই যেতম। আপনারা গেলে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব। আপনি প্লেনে যাচ্ছেন?

না, ট্রেনে। এখানেও একজনকে প্রোটেক্ট করার ব্যাপার আছে; তরফদারের ম্যাজিক শোয়ের ওই বালক। তারও জীবন বিপন্ন। অন্তত তিনজন ব্যক্তির লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে ওর উপর। বুঝতেই তো পারছেন, এমন আশ্চর্য ক্ষমতাকে অসদুদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর অজস্র উপায় আছে।

বেশ তো, বললেন হিঙ্গোয়নি, আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারুন। আপনি তো এই জাদুকরের জন্য প্রোফেশনালি কাজ করছেন?

হ্যাঁ।

ফেলুদা অফারটা নিয়ে নিল। তবে বলল, এটা জেনে রাখবেন যে, শুধু আমার প্রোটেকশনে হবে না। আপনাকেও খুব সাবধানে চলতে হবে। আর সন্দেহজনক কিছু হলেই আমাকে জানাবেন।

নিশ্চয়ই। আপনি কোথায় থাকবেন?

হোটেল করোমণ্ডল। আমরা একুশে পৌঁছচ্ছি।

বেশ। ম্যাড্রাসেই দেখা হবে।

বাড়ি ফেরার পথে আমি বললাম,আচ্ছ ফেলুদা, ড্রইং রুমের দুদিকের দেয়ালে দুটো বেশ বড় বড় রেক্টাঙ্গুলার ছাপ দেখলাম। –অনেক দিনের টাঙানো ছবি তুলে ফেললে যেমন হয়।

গুড অবজারভেশন, বলল ফেলুদা। বোঝাই যাচ্ছে ও জায়গায় দুটো বাঁধানো ছবি ছিল–সম্ভবত অয়েল পেন্টিং।

সেগুলো যে আর নেই, বললেন জটায়ু, সেটার কোনও সিগনিফিক্যান্স আছে কি?

বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছেন।

তার সিগনিফিক্যান্স?

সাতশো ছেষট্টি রকম সিগনিফিক্যান্স। সব শোনার সময় আছে কি আপনার?

আবার সজারু!-আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে আপনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

সেটার সময় এখনও আসেনি, লালমোহনবাবু! তথ্যটা আমার মস্তিষ্কের কম্পিউটারের মেমরিতে পুরে দিয়েছি। প্রয়োজনে বোতাম টিপলেই ফিরে পাব।

আপনি যে এই হিঙের কচুরির কেসটাও নিলেন—দুদিক সামলাতে পারবেন তো?

ফেলুদা কোনও উত্তর না দিয়ে ভাসা-ভাসা চোখে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, খট্‌কা...খট্‌কা...খাটুকা...

০৮. ভারত সফর

পরদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি, তরফদার সম্বন্ধে খবর বেরিয়েছে যে উনি উনিশে ডিসেম্বর দলবল নিয়ে দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছেন, 1পঁচিশে ডিসেম্বর ম্যাড্রাসে ওঁর প্রথম শো।

ফেলুদা চুল ছাঁটতে গিয়েছিল, দশটা নাগাত ফিরল। ওকে খবরটার কথা বলতে ও গম্ভীরভাবে বলল, দেখেছি। .. আত্মপ্রচারের লোভ খুব কম লোকেই সামলাতে পারে রে, তোপ্‌সে! আমি একটু নরম-গরম কথা শোনাব বলে ওকে ফোন করেছিলাম, কারণ—বুঝতেই তো পারছিস—এই খবর বেরোনোর ফলে আমার কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে।

তরফদার কী বললেন?

ফেলুদা একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, বিলে কী-আজকের দিনে শো-ম্যানদের পাবলিসিটি ছাড়া গতি নেই, মিস্টার মিত্তির; ও নিয়ে আপনি কাইন্ডলি আমাকে কিছু বলবেন না। আমি বললাম-যে-তিনজন ব্যক্তি নয়নের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিচ্ছে, তারা যে তোমার প্রোগ্র্যামটা জেনে গেল, সেটা কি ভাল হল?-তাতে ছাক্রা বলল—আপনি চিন্তা করবেন না। আমি যেভাবে ওদের বলেছি, আমার বিশ্বাস তাতে ওরা নয়নকে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছে। -এর পর আর কী বলি বল? সত্যি যদি তাই হয় তা হলে তো আমার আর কোনও প্রয়োজনই থাকে না। কিন্তু আমি তো জানি যে নয়নের বিপদ-এবং সেই সঙ্গে আমার দায়িত্ব—-এখনও পুরোমাত্রায় রয়েছে! অর্থাৎ আমার দিক থেকে কাজে টিলে দেবার কোনও প্রশ্নই আসে না।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ, আর তার পরে পর পর দুবার কলিং বেল টেপার শব্দে বুঝলাম জটায়ু হাজির। এখন সোয়া দশটা; ভদ্রলোক সাধারণত নটা-সাড়ে নটার মধ্যে চলে আসেন। আজ কোনও কারণে দেরি হয়েছে।

দেখে ভাল লাগল যে ফেলুদার মুখ থেকে মেজাজ খিচড়ানো ভাবটা চলে গেল।

খবর আছে মশাই, খবর আছে! ঘরে ঢুকেই চোখ বড় বড় করে বললেন জটায়ু।

দাঁড়ান, দেখি আমি কত দূর আন্দাজ করতে পারি, বললেন ফেলুদা। আপনি নিউ মার্কেটে গেসলেন। ঠিক?

কী করে জানলেন?

আপনার কোটের বুক পকেট থেকে আইডিয়াল স্টোর্সের ক্যাশমেমোর ইঞ্চি খানেক বেরিয়ে আছে। তা ছাড়া আপনার কোটের বাঁ দিকের সাইড পকেট এমনভাবে ঝুলেফুলে রয়েছে যে বাঝাই যাচ্ছে আপনার প্রিয় টুথপেস্ট ফরহানসের একটি ফ্যামিলি সাইজ প্যাকেট রয়েছে ওখানে।

বোঝে!—নেক্সট?

আপনি রেস্টোরান্টে গিয়ে স্ট্রবেরি আইসক্রিম খেয়েছিলেন—তার দু ফোঁটা আপনার শার্টে পড়েছে।

সাবাশ!—নেক্সট?

আপনি একা কখনও রেস্টোরান্টে যান না। অর্থাৎ একটি পরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যার সঙ্গে আপনি যান।

জবাব নেই!—নেক্সট?

আপনি তাকে নিয়ে যাননি, সেই আপনাকে নিয়ে গোসল। কারণ আপনাকে এত কাল চিনে অন্তত এটুকু জানি যে আপনার এমন কোনও বন্ধু এখন নেই, যাকে আপনি রেস্টোরান্টে নিয়ে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়াবেন।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। —নেক্সট?

এ ব্যক্তির সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে আপনার। পুরনো আলাপী বলতে আমরা দুজন ছাড়া আপনার আর কেউ নেই। তরফদার কি? না। তার এত সময় নেই; সে এখন সফরের তোড়জোড় করছে। চতুলেভীির কেউ কি? হজসন নন, কারণ সে ইনভাইট করলে আপনি রিফিউজ করবেন—একটানা ইংরিজি বলাটা আপনার পারদর্শিতার মধ্যে পড়ে না। তারকনাথ? উঁহু, তাঁর নিউ মার্কেটে কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না; উত্তর কলকাতায় দোকানের অভাব নেই। আর তা ছাড়া আমার ধারণা, তাঁর বাজার করার জন্য মাইনে করা লোক আছে। তা হলে বাকি রইল কে?

ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট! আপনি ধরে ফেলেছেন, ফেলুবাবু, ধরে ফেলেছেন! অনেক দিন পরে আপনার চিন্তাশক্তি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নমুনা পাওয়া গেল। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!

বসাক তো?

বসাক, বসাক—নন্দলাল বসাক! আজি প্রথম পুরো নামটা জানলুম।

আপনার সঙ্গে তাঁর কী কথা?

কথা ভাল নয়, ফেলুবাবু। ভদ্রলোক তরফদারকে আরও দশ হাজার ডলার অফার করেছিলেন। তার মানে ত্রিশ। আজকাল এক ডলারে কত টাকা?

সতেরোর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।

হিসেব করুন, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।

তরফদার কী বলেন?

তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলে বসাকের মেজাজ খিচড়ে যায়। তরফদারকে কিছু বলেননি, তবে আমাকে বললেন—আপনি ওই ভেলকিরামকে বলে দেবেন যে, বসাকের সংকল্পে ব্যাগড়া দেবে এমন লোক এখনও জন্মায়নি। শেষের কথাগুলো আরও সাংঘাতিক; বললেন—বড়দিনে মাদ্রাজে তরফদারের শো ওপন করছে; ইফ মাই নেম ইজ নন্দ বসাক—তা হলে সেই শো থেকে ওই খোকার আইটেম বাদ দিতে হবে। টেল দিস টু ইওর টিকটিকি ফ্রেন্ড।

ফেলুদার চেহারার সঙ্গে অনেক বাঙালিই পরিচিত, কাজেই বসাক যে তাকে চিনে ফেলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু কেন যেন আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

বসাকের হদিস তো তবু পাওয়া গেল, বলল ফেলুদা, তেওয়ারি ইজ আউট অফ দ্য পিকচার) এখন বাকি তারকনাথ আর হজসন।

তারকনাথ কেন—গাওয়াঙ্গি বলুন! তারকনাথ খ্যাপাটে হতে পারেন, কিন্তু তাঁর যা বয়স তাতে তিনি এক কিছু করতে পারবেন না।

একেই ফেলুদা বলে টেলিপ্যাথি। তারকনাথের কথা ওঠার মিনিট খানেকের মধ্যেই কলিং বেল বাজায় দরজা খুলে দেখি স্বয়ং টি এন টি।

মিঃ মিত্তির আছেন? আসুন, আসুন, ভিতর থেকে বলল ফেলুদা। আপনিও দেখছি আমায় চিনে ফেলেছেন।

তা চিনব না কেন? ঘরে ঢুকে একটা কাউচে বসে বললেন ভদ্রলোক। আর আপনাকে যখন চিনেছি, তখন আপনার এই ল্যাংবোটটিকেও চিনেছি। আপনিই তো জটায়ু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একবার ভেবেছিলাম। আপনাকেও আমার আজব ঘরে এনে রাখব, কারণ গাঁজাখুরি গপ্পো লেখায় তো আপনি একমেবাদ্বিতীয়ম! হণ্ডুরাসে হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভদ্রলোকের এই ঘর-কাঁপানো হাসির সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় হল।

তা হলে আপনার সঙ্গে মাদ্রাজে দেখা হচ্ছে? ফেলুদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন তারক ঠাকুর।

আপনি যাওয়া স্থির করে ফেলেছেন?

শুধু আমি কেন? আমার ইউগ্যান্ডার অপোগণ্ডটিও যাবেন! হাঃ হাঃ হাঃ-কেমন? ভাল হয়েছে? জটায়ু?

আপনি ট্রেনে যাচ্ছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তা ছাড়া তো উপায় নেই। প্লেনের সিটে তো গাওয়াঙ্গি বসতেই পারবে না!

আরেক দফা হো হো করে হেসে ভদ্রলোক উঠে পড়ে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলি মিঃ মিত্তির-এমন অনেক সিচুয়েশান আছে, যেখানে শারীরিক শক্তির কাছে মানসিক শক্তি দাঁড়াতেই পারে না। গাওয়াঙ্গির চেয়ে আপনার বুদ্ধি যে অনেক গুণে বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলেও, গাওয়াঙ্গিয় যে শারীরিক বল, তার শতাংশের একাংশও আপনার নেই। –গুড বাই।

ভদ্রলোক যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনই হঠাৎ চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম-এই গাওয়াঙ্গি বস্তুটিকে একবার চাক্ষুষ দেখতেই হবে।

০৯. স্টেশন থেকে হোটেলে

স্টেশন থেকে হোটেলে আসার পথে মাদ্রাজের চেহারা দেখে জটায়ু বললেন, মশাই, এই শহরের নাম কলকাতা রাম্বে দিল্লির সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয় কেন তার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পশ্চিমবাংলার যে কোনও মফস্বল টাউন এর চেয়ে বেশি গমগমে। তা ছাড়া ডিসেম্বর মাসে গরমটা কী রকম দেখেছেন? আর ইয়ে—আমরা যে-হোটেলে যাচ্ছি, সেখানে দিশি বিদেশি সব রকম খাবার পাওয়া যায় তো? মাদ্রাজি মেনুতে শুনিচি শুধু তিনটে নাম থাকে। আমি খাইয়ে না হতে পারি, কিন্তু যা খাব, সেটা মুখরোচক না হলে আমার সাধ মেটে না।

আমার কিন্তু শহরটা খারাপ লাগছিল না, যদিও গামাগমে ভগবটা একেবারেই নেই। অনেক দিন পরে একটা বড় শহরে এসে চারিদিকে চ্যাঙ চ্যাঙ বাড়ির ভিড় নেই দেখে অদ্ভুত লাগছিল। রাস্তা দিব্যি ভাল—এখন পর্যন্ত গাড়িড়াও পাইনি। আর যেটা পাইনি সেটা হল ট্র্যাফিক জ্যাম। তা সত্ত্বেও লালমোহনবাবু কেন মুখ বেজার করে আছেন জানি না।

বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কথা তো কয়েক বার বলিটি আপনাদের, হঠাৎ বললেন জটায়ু।

আপনার সেই এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের কবি?

কবি অ্যান্ড পর্যটক। শ্রমণের নেশা ছিল ভদ্রলোকের।

উনি কি মাদ্রাজেও এসেছিলেন?

সার্টেনলি।

মাদ্রাজ নিয়ে পদ্য আছে, ওঁর?

সার্টেনলি! জাস্ট সিক্স লাইনস। শুনুন–

বড়ই হতাশ হয়েছি আজ।
তোমারে হেরিয়ে মাদ্রাজ!–
ভাষা হেথা দুবোধ্য তামিল
অন্য ভাষার সাথে নেই কোনও মিল–
ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা?
ওরে বাবা, এ শহরে কেউ কভু এস না!

তৃপ্তিবে? ভুরু কুঁচকে বলল ফেলুদা।

হোয়াই নট? মল্লিকের উপর মাইকেলের দস্তুর মতো প্রভাব ছিল। তৃপ্তিবে হল নামধাতু। আপনি গোয়েন্দা তাই হয়তো জানেন না; আমরা সাহিত্যিকরা জানি। বলছি না-হাইলি ট্যালেন্টেড। পোড়া দেশ বলে কলকে পেলেন না।

আমি দেখেছি বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কথা বলতে গেলেই জটায়ু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, আর এতটুকু সমালোচনা করলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আমি আর ফেলুদা তাই চুপ মেরে গেলাম।

এই ফাঁকে বলে রাখি যে, ট্রেনে কোনও গণ্ডগোল হয়নি। তরফদার, শঙ্করবাবু আর নয়ন এ সি ফাস্ট ক্লাসে আমাদের এক বাগিতেই ছিলেন। দলের বাদবাকি সব ছিল সেকেন্ড ক্লাসে। যে তিনজনকে নিয়ে চিন্তা—হজসন, তারকনাথ আর বসাক—তারা কেউ এ ট্রেনে এসে থাকলেও আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ম্যাড্রাস সেন্ট্রালে নেমেও এদের কাউকে দেখিনি। হিঙ্গোয়ানি আজ রাত্রেই প্লেনে আসছেন, আর আমাদের হোটেলেই থাকবেন।

করোমণ্ডলের ঝলমলে লবিতে ঢুকে লালমোহনবাবুর মুখে প্রথম হাসি দেখা দিল। এ দিকে ও দিকে দেখে বললেন, নাঃ, অনবদ্যু মশাই অনবদ্য! ইডলি-দোসার দেশে এ জিনিস ভাবাই যায় না।

ট্রেনেই আলোচনা করে ঠিক হয়েছে যে আমরা প্রথম তিনটে দিন একটু ঘুরে দেখব। সঙ্গে অবশ্য নয়ন আর তরফদারও থাকবে। ফেলুদা বলেছে-আমরা এলিফ্যান্টা দেখেছি, এলোরা দেখেছি, উড়িষ্যার মন্দির দেখেছি। – মাদ্রাজে এসে মহাবলীপুরম দেখলে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নমুনাটা দেখা হয়ে যাবে। তোপ্‌সে, তুই গাইডবুকটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিস। কতগুলো তথ্য জানা থাকলে দেখতে আরও ভাল লাগবে।

রাত্রে নটার মধ্যে ডাইনিং রুমে গিয়ে মোগলাই খান খেয়ে ঠাণ্ডা ঘরে দিব্যি আরামে ঘুম দিলাম। পরদিন সকালে উঠে ফেলুদা বলল, এক বার তরফদারের খোঁজটা নেওয়া দরকার।

আমরা দুজন আমাদের চার তলার ৪৩৩ নম্বর ঘর থেকে তিন তলার ৩৮২ নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম।

দরজা খুলে দিলেন তরফদার নিজেই। ঘরে ঢুকে দেখি শঙ্করবাবুও রয়েছেন, আর আরেকটি ভদ্রলোক, যাকে দেখলেই মাদ্রাজি বলে বোঝা যায়। কিন্তু নয়নকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

গুড মর্নিং মিঃ মিত্তির, একগাল হেসে বললেন তরফদার-ইনি মিঃ রেডি। এর রোহিণী থিয়েটারেই আমার শো। বলছেন প্রচুর এনকোয়ারি আসছে। এর ধারণা, দুর্দান্ত সেল হবে।

নয়ন কই? তরফদারের কথাগুলো যেন অগ্রাহ্য করেই জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

এখানকার সবচেয়ে নামী কাগজ হিন্দু-র একজন রিপোর্টার নয়নকে ইন্টারভিউ করছে? বললেন তরফদার। এর ফলে আমাদের দারুণ পাবলিসিটি হবে।

কিন্তু কোথায় হচ্ছে সেই ইন্টারভিউ?

হোটেলের ম্যানেজার নিজে একতলার কনফারেন্স রুমে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এও বলা আছে বাইরের কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। তা ছাড়া—

তরফদাবের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। হোটেলের করিডর দিয়ে— আমি পিছনে।

লিফুট না নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উর্ধর্বশ্বাসে নামলাম আমরা-ফেলুদা সমানে দাঁতে দাঁত চেপে হিন্দি, ইংব্রিজি ও বাংলায় তরফদারের উদ্দেশে গালি দিয়ে চলেছে।

নীচে পৌঁছে। একজন বেয়ারাকে সামনে পেয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, হায়্যার ইজ দ্য কনফারেন্স রুম?

বেয়ারা দেখিয়ে দিল, আমরা হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। তার মাঝখানে লম্বা টেবিলের দুপাশে আর দু মাথায় সারি সারি চেয়ার। একটা চেয়ারে নয়ন বসে আছে, তার পাশের চেয়ারে একজন দাঁড়িওয়ালা লোক নোটবই খুলে ডট পেন হাতে নিয়ে নয়নের সঙ্গে কথা বলছে।

ফেলুদা তিন সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল। তারপর ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে এক টানে রিপোর্টারের গাল থেকে দাড়ি, আর আরেক টানে ঠোঁটের উপর থেকে গোঁফ খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে দেখলাম ছদ্মবেশের তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন হেনরি হজসন।

গুড মর্নিং! উঠে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ হাসি হেসে বললেন হজসন।

ফেলুদা নয়নের দিকে ফিরল।

উনি কী জিজ্ঞেস করছিলেন তোমাকে?

ঘোড়ার কথা।

আমার কাজ এখানে শেষ হলেও আমার আপশোস নেই, বললেন। হজসন। আগামী তিন দিনের সব কটা রেসের উইনিং হর্সের নম্বর আমি জেনে নিয়েছি। আমি এখন বেশ কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। গুড ডে স্যার

হজসন গটগটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা কপালে হাত দিয়ে ধাপ করে হজসনের চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে গভীর বিরক্তির সুরে বলল, নয়ন, এবার থেকে কোনও বাইরের লোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তুমি বলবে-ফেলুকাক সঙ্গে থাকলে বলব, না হলে নয়। বুঝেছ?

নয়ন মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে বুঝেছে।

আমি বললাম, তবে একটা কথা ফেলুদা—হজসন আর জ্বালাবে না; সে এখন কলকাতায় ফিরে গিয়ে রেস খেলবে।

সেটা ঠিক, কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের জাদুকরটি কত দায়িত্বজ্ঞানহীন। ম্যাজিশিয়ানদের এর চেয়ে বেশি কমনসেন্স থাকা উচিত।

আমরা নয়নকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলাম তরফদারের ঘরে।

চমৎকার পাবলিসিটি হবে তোমার। শ্লেষ-মাখানো সুরে তরফদারকে বলল ফেলুদা।

নয়ন কাকে ইন্টারভিউ দিচ্ছিল, জানো?

কাকে?

মিস্টার হেনরি হজসন।

ওই দাড়িওয়ালা–?

হ্যাঁ, ওই দাড়িওয়ালা। তার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। এই যদি তোমার আক্কেলের নমুনা হয়, তা হলে কিন্তু আমি তোমাকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারব না। তোমার অনুমান যে ভুল সে তো দেখতেই পাচ্ছ; হজসন যদি ম্যাড্রস অবধি ধাওয়া করতে পারে, তা হলে অন্য দুজনই বা করবে না কেন? আমি জানি যে বিপদের আশঙ্কা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। এ অবস্থায় আমি যা বলছি, তা তোমাকে মানতেই হবে।

বলুন স্যার, হেঁট মাথা চুলকে বললেন তরফদার।

মিঃ রেডির তরফ থেকে যেটুকু পাবলিসিটি না করলেই নয়, সেটুকু তিনি করবেন; কিন্তু তোমরা—তুমি বা শঙ্কর পাবলিসিটির ধারে-কাছেও যাবে না। প্রেস পীড়াপীড়ি করলেও তাদের কাছে তোমরা মুখ খুলবে না। তোমার এই সফর যদি সাকসেসফুল হয়, তা হলে সেটা হবে নয়নের জোরে, তোমাদের পাবলিসিটির জোরে নয়। বুঝেছ?

বুঝেছি স্যার।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে লালমোহনবাবুকে ঘটনাটা বলতে উনি বললেন, ঠিক এইটেরই দরকার ছিল। ভয় হচ্ছিল যে, মাদ্রাজে এসে বুঝি কেসটা থিতিয়ে যাবে। তা নয়-এখন আবার দিব্যি। জমে উঠেছে।

ঠিক হয়েছিল দশটার সময় আমরা দুটো ট্যাক্সি নিয়ে বেরোব। মহাবলীপুরম আজ নয়, কাল। আজ যাব স্নেক পার্ক দেখতে। হুইটেকার নামে এক আমেরিকানের কীর্তি এই স্নেক পার্ক। গাছপালায় ভরা পার্কও বটে, আবার সেই সঙ্গে সাপের ডিপো ও বটে।

যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, লালমোহনবাবু অলরেডি তৈরি হয়ে আমাদের ঘরে এসে হাজির, এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি মিঃ হিঙ্গোয়ানি।

মে আই কাম ইন?

টি ভি-টা খোলা ছিল, যদিও দেখবার মতো কিছুই হচ্ছিল না, ফেলুদা সেটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—প্লিজ কাম ইন।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাউচে বসে বললেন, সো ফার—নো ট্রাবল।

এ তো সুসংবাদ, বলল ফেলুদা।

আমার বিশ্বাস তেওয়ারি আমার ম্যাড্রাসে আসার খবরটা জানে না। আমি কাউকে না। বলে চলে এসেছি।

আপনি নিজে সাবধানে আছেন তো?

তা আছি।

একটা কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলছি—আপনি যখন ঘরে থাকবেন, তখন কেউ বেল টিপলে আপনি নাম জিজ্ঞেস করে গলা চিনে, তার পর দরজা খুলবেন, তার আগে নয়।

হিঙ্গোয়ানি কিছু বলার আগেই আমাদের দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি, নয়নকে নিয়ে তরফদার হাজির।

এসো ভিতরে, বলল ফেলুদা।

এই সেই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বালক কি? দুজনে ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন হিঙ্গোয়ানি।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি তার ঠোঁটের কোণে হাসি।

আপনার সঙ্গে এই দুজনের পরিচয় করিয়ে দেবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? হিঙ্গোয়ানিকে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

মিঃ হিঙ্গোয়ানি, আপনি আমাকে আপনার নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করেছেন। এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে গোয়েন্দার কাছ থেকে মক্কেল যদি কোনও জরুরি তথ্য গোপন করেন তা হলে গোয়েন্দার কাজটা আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

আপনি কী বলতে চাইছেন?

সেটাও আপনি খুব ভাল করেই জানেন, কিন্তু না-জানার ভাণ করছেন। অবিশ্যি সত্য গোপন করার অভিযোগ শুধু আপনার বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য নয়। এর বিরুদ্ধেও বটে।

ফেলুদা শেষ কথাটা তরফদারকে উদ্দেশ করে বলল; তরফদার কিছু বলতে না পেরে ফ্যালি-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আপনারা যখন মুখ খুলছেন না, তখন আমিই বলি।

ফেলুদার দৃষ্টি এখনও তরফদারের দিকে।

সুনীল, তুমি একজন পৃষ্ঠপোষকের কথা বলছিলে। আমি কি অনুমান করতে পারি যে, মিঃ হিঙ্গোয়ানিই সেই পৃষ্ঠপোষক?

হিঙ্গোয়ানি চোখ কপালে তুলে চেয়ার থেকে প্রায় অর্ধেক উঠে পড়ে বললেন, বাট হাউ ডিড ইউ নো? এও কি ম্যাজিক?

না, মিঃ হিঙ্গোয়ানি, ম্যাজিক নয়। এ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ রাখার ফল। আমরা গোয়েন্দারা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি দেখি, বেশি শুনি।

কী দেখে বা শুনে আপনি এই তথ্যটা আবিষ্কার করলেন?

গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক শো-তে এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে এই জ্যোতিষ্ক দুটো গাড়ির নম্বর বলে দেয়। তার মধ্যে একটা নম্বর-ডব্লিউ এম. এফ ছয় দুই তিন দুই-দেখলাম। আপনার গ্যারাজের সামনে দাঁড়ানো কনটেসার নম্বর। এই যুরক কি আপনার বাড়ির লোক নন এবং তিনি শো থেকে ফিরে এসে কি আপনাকে জ্যোতিষ্কর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলেননি?

ইয়েস, বলেছিল। মোহন, আমার ভাইপো... হিঙ্গোয়ানির কেমন যেন হতভম্ব ভাব।

আর একটা ব্যাপার আছে, বলল ফেলুদা! সেদিন আপনার ড্রইংরুমের বুক কেসে দেখলাম পুরো একটা তাকভর্তি ম্যাজিকের বই। তার মানে-

ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস! ফেলুদাকে বাধা দিয়ে বললেন হিঙ্গোয়ানি। ওগুলোর মায়া আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বাবা আমার ম্যাজিকের সব সরঞ্জাম ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বই ফেলেননি।

তরফদারের দিকে চেয়ে দেখি, তাঁর শোচনীয় অবস্থা।

তরফদারকে কোনও দোষ দেবেন না, মিঃ মিটার, বললেন হিঙ্গোয়ানি। ও আমারই অনুরোধে আমার নামটা প্রকাশ করেনি।

কিন্তু এই গোপনতার কারণ কী?

একটা বড় কারণ আছে, মিঃ মিটার।

কী

আমার বাবা এখনও জীবিত; ফৈজাবাদে থাকেন, আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। ধিরাশি বছর বয়স। কিন্তু এখনও টনটনে জ্ঞান, মজবুত শরীর। তিনি যদি জানেন যে, এত দিন বাদে আমি আবার ম্যাজিকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি, তা হলে তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

ফেলুদা ভ্রূকুটি করে বার তিনেক মাথা উপর-নীচ করে বলল, বুঝেছি।

হিঙ্গোয়ানি বলে চললেন, মোহন শো দেখে ফিরে এসেই এই ছেলের অসামান্য ক্ষমতার কথা আমাকে বলে। তখনই আমার মাথায় আসে, আমি এই জাদুকরের শো ফাইনান্স করব। যখন থেকে তেওয়ারির সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, আমাকে অবিলম্বে টি এইচ সিন্ডিকেটের পার্টনারশিপে ইস্তফা দিয়ে রোজগারের নতুন রাস্তা দেখতে হবে। রবিবার রাত্রে জ্যোতিষ্কর কথা শুনে সোমবার সকালেই আমি তরফদারের বাড়িতে গিয়ে আমার প্রস্তাবটা দিই। তরফদার রাজি হয়ে যায়। এর দুই দিন বাদেই তেওয়ারির টাকা-চুরি ধরা পড়ে এবং আমার সঙ্গে তার সংঘর্ষ সপ্তমে চড়ে। আমি আর থাকতে না পেরে তেওয়ারিকে একটা চার লাইনের চিঠিতে জানিয়ে দিই যে, আমি অসুস্থ। ডাক্তারের প্রস্তাব মতো এক মাসের অবসর নিচ্ছি। তার পরদিন থেকেই আমি আপিসে যাওয়া বন্ধ করি।

তার মানে আপনি এমনিতেই মাদ্রাজে আসছিলেন তরফদারের শোয়ের জন্য?

হ্যাঁ, কিন্তু আমার বিপদের আশঙ্কটাও সম্পূর্ণ সত্যি। অর্থাৎ আপনার সাহায্য আমাকে নিতেই হত।

আর আপনি মাদ্রাজে যে একটা চাকরির সম্ভাবনার কথা বলছিলেন?

সেটা সত্যি নয়।

আই সি! বলল ফেলুদা। তা হলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে—আপনার জীবন বিপন্ন, যার কারণ হল তেওয়ারি সংক্রান্ত ঘটনা; আর জ্যোতিষ্কও ঘোর বিপদে পড়তে পারে দুজন অত্যন্ত লোভী আর বেপরোয়া ব্যক্তির চক্রান্তে। এই দুই বিপদই সামলানোর জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। নয়নের সঙ্গে সব সময় আমাদের কেউ-না-কেউ থাকবে। এখন আপনি বলুন, আপনি কীভাবে আমাদের কাজটা সহজ করতে পারেন।

হিঙ্গোয়ানি বললেন, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। মাদ্রাজে আমি এর আগে অনেক বার এসেছি। কাজেই এখানে আমার দেখবার কিছু বাকি নেই। তরফদারের শো এক বার শুরু হলে তার রিপোর্ট আমি ওর ম্যানেজারের কাছ থেকে পাব এবং শো-এর দরুন পেমেন্ট যা করার তা ম্যানেজারকেই করব। অর্থাৎ আমি ঘরেই থাকব এবং চেনা লোক কি না যাচাই না করে দরজা খুলব না।

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দুজনও।

এসো, নয়নবাবু।

জটায়ু নয়নের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, নয়ন বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাতটা ধরে নিল। বুঝলাম, জটায়ুকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেছে।

১০. স্নেক পার্কে

স্নেক পার্কে বেশিক্ষণ ছিলাম না, কিন্তু এটা বুঝেছি যে জায়গাটা একেবারে নতুন ধরনের। মাত্র একজন লোকের মাথা থেকে যে এ জিনিস বেরিয়েছে, সেটা বিশ্বাস করা যায় না। যত রকম সাপের নাম আমি শুনেছি তার সব, আর তার বাইরেও বেশ কিছু এই পার্কে রয়েছে। তা ছাড়া, সাপ দেখা ছাড়াও, পার্কে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দও এখানে পাওয়া যায়।

প্রথম দিনের এই আউটিং-এ কোনও উল্লেখযোগ্য বা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেনি। যদিও হজসনের ছদ্মবেশের কথা জানার জন্যেই বোধ হয় দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই জটায়ু বসাক বলে সন্দেহ করে নয়নকে একটু কাছে টেনে নিচ্ছিলেন।

সাপ দেখে এদিক-ওদিক ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা বেশ বড় জলা জায়গায় গোটা পাঁচেক কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। দেখে মনে হল তারা সব কটাই ঘুমোচ্ছে। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে এ-দৃশ্য দেখছি, লালমোহনবাবু নয়নকে ফিসফিস করে বলছেন—তুমি আরেকটু বড় হলে তোমাকে আমার করাল কুভীর বইটা দেব—এমন সময় দেখি দু হাতে দুটো বালতি নিয়ে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা একটা লোক কুমিরগুলো থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কুমিরগুলো এবার একটু নড়েচড়ে উঠল। লোকটা এবার বালতিতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে এক-একটা কোলা ব্যাঙ বার করে কুমিরগুলোর দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল। আশ্চর্য এই যে, প্রত্যেকটা ব্যাঙই কোনও-না-কোনও কুমিরের হাঁ-করা মুখের ভিতর গিয়ে পড়ল। কুমিরকে ব্যাঙ চিবিয়ে খেতে আর কোনওদিন দেখিওনি আর দেখব বলে ভাবিওনি।

গোলমেলে ঘটনা যা ঘটে সেটা দ্বিতীয় দিনে, আর সেটার কথা ভাবলেই মনে বিস্ময়, আতঙ্ক, অবিশ্বাস—সব একসঙ্গে জেগে ওঠে।

***

গাইডবুক পড়ে জেনেছিলাম মহাবলীপুরম ম্যাড্রাস থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে। রাস্তা নাকি ভাল, যেতে দু ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। কালকের মতোই দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেছিলেন শঙ্করবাবু। এবার নয়ন তরফদারের সঙ্গে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল। কারণ আর কিছুই নয়, জটায়ুর সঙ্গে ওর বেশ জমে গেছে। ভদ্রলোক নয়নকে তাঁর লেটেস্ট বই অতলান্তিক আতঙ্ক-র গল্প সহজ করে বলে শোনাচ্ছেন। একবারে তো শেষ হবার নয়, তাই খেপে খেপে শোনাচ্ছেন। গাড়িতে তাই ফেলুদা আর জটায়ুর মাঝখানে বসল নয়ন। আর আমি সামনে।

যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছি, আমরা ক্রমে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছি। মাদ্রাজ শহর সমুদ্রের ধারে হলেও আমরা এখন অবধি সমুদ্র দেখিনি, তবে সন্ধেবেলা সমুদ্রের দিক থেকে আসা হাওয়া উপভোগ করেছি।

সোয়া দু ঘন্টার মাথায় সামনের দৃশ্যটা হঠাৎ যেন ফাঁক হয়ে গেল। ওই যে দূরে গাঢ় নীল জল, আর সামনে বালির উপর ছড়িয়ে উচিয়ে আছে সব কী যেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম যে সেগুলো মন্দির। মূর্তি আর বিশাল বিশাল পাথরের গায়ে খোদাই করা নানারকম দৃশ্য।

আমাদের গাড়ি যেখানে এসে থামল, তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভ্যান। আর তার পরেই একটা প্রকাণ্ড লাক্সারি কোচ। কোচে একে একে উঠছে এক বিরাট টুরিস্ট দল। তাদের দেখেই কেন জানি বোঝা যায়। তারা আমেরিকান। কত রকম পোশাক, কত রকম টুপি, চোখে কতরকম ধোঁয়াটে চশমা, কাঁধে কত রকম ঝোলা।

বিগ বিজনেস, টুরিজম, বলে জটায়ু নয়নকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

ফেলুদা আগে এখানে না এলেও, কোথায় কী আছে সব জানে। ও আগেই বলে রেখেছিল—অনেক দূর ছড়িয়ে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে; তবে নয়নকে নিয়ে তো আর অত ঘোরা যাবে না; তুই অন্তত চারটি জিনিস অবশ্যই দেখিস—শোর টেম্পল, গঙ্গাবতরণ, মহিষমণ্ডপ গুহা আর পঞ্চপাণ্ডব গুহা। জটায়ু যদি দেখতে চান তো দেখবেন; না হলে নয়নকে সামলাবেন। তরফদার। আর শঙ্কর কী করবে। জানি না; কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় না। ওদের মধ্যে শিল্পপ্রীতি বলে কোনও বস্তু আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু একটা জটায়ু মার্কা প্রশ্ন করলেন।

এ তো বল্লভদের কীর্তি, তাই না মশাই?

ফেলুদা তার গলায় একটা বাজখাই টান এনে বলল, পল্লব, মিস্টার গাঙ্গুলী, পল্লব। নট বল্লভ।

কোন সেঞ্চুরি?

সেটা খোকাকে জিজ্ঞেস করুন, বলে দেবে।

লালমোহনবাবু অবিশ্যি সেটা আর করলেন না; খালি মৃদুস্বরে একবার সজারু বলে চুপ। করে গেলেন। আমি জানি মহাবলীপুরম সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল।

প্রথমেই শোর টেম্পল বা সমুদ্রের ধারের মন্দিরটা দেখা হল। মন্দিরের পিছনের পাঁচিলের গায়ে ঢেউ এসে ঝাপটা মারছে।

এরা স্পট সিলেক্ট করতে জানত মশাই, ঢেউয়ের শব্দের উপরে গলা তুলে মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ডান পাশে দূরে একটা হাতি আর একটা ষাঁড়ের মূর্তির পাশে কয়েকটা ছাট ছাট মন্দিরের মতো জিনিস রয়েছে। ফেলুদা বলল সেগুলো পাণ্ডবদের রথ। — যেটা দেখতে কতকটা বাংলার গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরের মতে, সেটা হল দ্রৌপদীর রথ।

মাথা ঘুরে গেল গঙ্গাবতরণ দেখে। এটাকে অবিশ্যি অর্জ্জুনের তপস্যাও বলা হয়। বাইরেই রুয়েছে ব্যাপারটা, আর বোঝাই যায় যে একটা বিশাল পাথরের স্ল্যাব দেখে শিল্পীদের এই দৃশ্য খোদাই করার আইডিয়া মাথায় আসে। দুটো বিরাট হাতি, আর তার চতুর্দিকে অজস্র মানুষের ভিড়।

লালমোহনবাবু নয়নকে নিয়ে এখনও আমাদের পাশেই ছিলেন, দৃশ্যটার দিকে চোখ রেখে বললেন, এ তো ছেনি-হাতুড়ির কাজ, তাই না?

হ্যাঁ, গম্ভীরভাবে বলল ফেলুদা। তবে ভেবে দেখুন-হাজার হাজার প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা রয়েছে আমাদের সারা দেশ জুড়ে, দশ-বারো শতাব্দী ধরে সেগুলো তৈরি হয়েছে, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেও তার সামান্যতম অংশেও একটিও হাতুড়ির বেয়াড়া আঘাত বা ছেনির বেয়াড়া অ্যাঙ্গেলের চিহ্ন পাবেন না। এ তো মাটি নয় যে, আঙুলের চাপে এদিক-ওদিক করে ত্রুটি সংশোধন হয়ে যাবে; পাথরের ত্রুটি শুধরানোর কোনও উপায়। নেই। এ যুগে সেই পারফেকশনের সহস্রাংশও আর অবশিষ্ট নেই! কোথায় গেল কে জানে!

তরফদার আর শঙ্করুবাবু এগিয়ে গিয়েছিলেন; ফেলুদা বলল, যা, তোরা গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব আর মহিষমণ্ডপ গুহাগুলো দেখে আয়। আমি এটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখছি। তাই সময় লাগবে।

ফেলুদার কাছ থেকে গাইড বুকটা চেয়ে প্ল্যান দেখে বুঝে নিলাম, গুহা দুটো দেখতে কোনদিকে যেতে হবে। লালমোহনবাবুকে মুখে বলে বুঝিয়ে দিলাম। তবে তিনি এখন মহাবলীপুরম ছেড়ে অতলান্তিকে চলে গেছেন, তাই আমার কথা কানো গেল কি না জানি না। না গেলেও, আমি এগোনোর আগেই তিনি গল্প শুরু করে নয়নকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কিছু দূর গিয়ে ডাইনে ঘুরে দেখি, একটা কাঁচা রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। প্ল্যান বলেছে এটা দিয়েই যেতে হবে। ঢেউয়ের আওয়াজ এখানে কম; তার চেয়ে বেশি জোরে শুনছি। লালমোহনবাবুর গলা। মনে হচ্ছে গল্প ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছচ্ছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, পঞ্চপাণ্ডব গুহায় পৌঁছে গেছি। –অন্তত বাইরের সাইনবোর্ডে তাই বলছে। আমি ঢোকার আগেই জটায়ু নয়নকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে আরও উপরে উঠে গেলেন। বুঝলাম আশ্চর্য সব শিল্পের নমুনা লালমোহনবাবুর কাছে মাঠে মারা যাচ্ছে।

ফেলুদার আদেশ, তাই পঞ্চপাণ্ডব গুহায় খানিকটা সময় দিলাম। একটা ঘাড়-ফেরানো গোরু আর তার পাশে দাঁড়ানো বাছুরের দৃশ্য দেখে মনে হল যে, ঠিক এই দৃশ্য আজও বাংলার যে কোনও গ্রামে দেখা যায়। শুধু গোরু

বাছুর কেন, মহাবলীপুরমের হাতি হরিণ বাঁদর ষাঁড় ইত্যাদি দেখে বুঝতে পারি তেরশো বছরেও এদের চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অথচ পোশাক বদলের জন্য সে যুগের মানুষকে আজ আর চেনার কোনও উপায় নেই।

গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম, যেগুলো কানে আর চোখে ধরা পড়ল।

এক, সূর্য ঢেকে গেছে ছাই রঙের মেঘে। গুডগুড়ুনি যে মেঘের ডাক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রোদের তেজটা চলে গিয়ে এখন সমুদ্রের হাওয়াটা আরও বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি তফাত ধরা পড়ে কানে। সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া চারিদিকে কোনও শব্দ নেই; আমি গুহাতে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকিনি। সামনে মহিষমর্দিনী গুহা। তার ভিতর থেকে লালমোহনবাবুর গলা পাওয়া উচিত। কারণ গল্পের বেশ জমাট অংশে তিনি গুহায় পৌঁছেছিলেন। অবিশ্যি তিনি গুহাতে না-চুকেই এগিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু কেন? ও দিকে তো আর কিছু দেখার নেই! কোথায় গেলেন ভদ্রলোক নয়নকে নিয়ে?

কেমন যেন একটা সংশয়ের ভাব আমাকে চেপে ধরল। আমি দেখলাম, মহিষমর্দিনী গুহার দিকে আমি দৌড়তে শুরু করেছি।

গুহার পাশে পৌঁছতেই আরেকটা শব্দ আমার আতঙ্ক সপ্তামে চড়িয়ে দিল।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

টি এন টি-র হাসি!

উর্ধশ্বাসে সামনে ছুটে গিয়ে মোড় ঘুরে একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে আমার নিশ্বাস মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

দেখলাম, একটা লাল-সাদা ডুরে-কাটা জামা আর কালো প্যান্ট পরা এক অতিকায় কৃষ্ণকায় প্রাণী-যাকে দানব বললে খুব ভুল হয় না-এক-বগলে জটায়ু আর অন্য বগলে নয়নকে নিয়ে দ্রুত পা ফেলে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

ভয়াবহ দৃশ্য, কিন্তু তখন আমার মাথায় খুন চেপে গেছে, আর তার ফলে শরীরে এনার্জি আর মনে সাহস এসে গেছে। আমি ফেলুদা! বলে একটা চিৎকার দিয়ে প্রাণপণে ছুটে গেলাম দানবটার দিকে-আমার উদ্দেশ্য পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা পা জাপটে ধরে তার হাঁটা বন্ধ করব।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম সেটা করেও কোনও ফল হল না। পা জড়িয়ে ধরতেই প্রথমে দানবটা একটি বিকট চিৎকার দিল-বুঝলাম, যেখানে বাদশা কামড়েছিল ঠিক সেখানেই আমি চাপ দিয়েছি। তার পরমুহূর্তে দেখলাম সেই জখম পায়ের ঝটিকানিতে আমি মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেছি। তার পর চোখের পলকে দেখি, আমি নয়নের সঙ্গে একই বগলের নীচে বন্দি হয়ে হাওয়া কেটে এগিয়ে চলেছি, আমার পা দুটো পেণ্ডুলামের মতো দুলছে দৈত্যটার মাংসপেশির চাপে আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলেও আমি শুনতে পাচ্ছি। অন্য বগলের তলা থেকে লালমোহনবাবুর মাগো! মাগো! আর্তনাদ।

আর হাসি?

সামনে বিশ হাত দূরে তারকনাথ হাসতে হাসতে লাফাচ্ছেন আর ডান হাত মাথার উপর তুলে লাঠি ঘোরাচ্ছেন।

কেমন? গাওয়াঙ্গি কাকে বলে, দেখলে? তারস্বরে প্রশ্ন করলেন টি এন টি।

কিন্তু এখন তো আর তিনি একা নেই! তাঁর পিছন থেকে এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন দুজন লোক। তার মধ্যে একজন অদ্ভুতভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বকের মতো এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

চমকদার স্যুনাল তরফদার।

এবার তরফদার তাঁর গতি না কমিয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে সাপের ফণার মতো দালাতে লাগলেন—তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টি সটান আমাদের যিনি বগলদাবা করেছেন তাঁর দিকে।

এই চাউনি, এই ঝুঁকে পড়া, হাতের এই ঢেউ খেলানো-এ সবই আমার চেনা। এ হল তরফদারের সম্মোহনের কায়দা।

তারকনাথ হঠাৎ উন্মাদের মতো লাঠি উচিয়ে তরফদারের দিকে ধাওয়া করতেই পিছন থেকে এক লাফে এগিয়ে এসে শঙ্করবাবু বুড়োর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিলেন।

এবার বুঝলাম আমাদের গতি কমে আসছে।

আকাশে আবার মেঘের গর্জন।

তারকনাথ এবার দু হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে ঘড়িঘড়ে গলায় একটা অদ্ভুত অচেনা ভাষায় গাওয়াঙ্গিকে কী যেন বললেন।

গাওয়াঙ্গি আর তরফদার এখন মুখোমুখি।

আমি বগলদাবা অবস্থাতেই কোনওরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে গাওয়াঙ্গির মুখের দিকে চাইলাম। এমন মুখ আমি আর দেখিনি। চোয়াল ঝুলে পড়ে দাঁত বেরিয়ে গেছে, আর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

বগলদাবা করা বিশাল হাত দুটো এবার ধীরে ধীরে নেমে এল; আমার পা এখন টিতে। ও দিকে লালমোহনবাবুও মাটিতে।

আপনারা গাড়িতে গিয়ে উঠুন! চোখের পাতা না ফেলে গাওয়াঙ্গির দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন তরফদার। আমরা এক্ষুনি আসছি?

উলটা দিকে দৌড় দেবার আগের মুহূর্তে দেখলাম, তারকনাথ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

ফেলুদা এখনও গঙ্গাবতরণের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের তিনজনকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখে যেন ও আপনা থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিল।

আমাদেরও আগে ও দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা চারজন হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম।

টার্ন ব্যাক্! টার্ন ব্যাক চেঁচিয়ে আদেশ দিল ফেলুদা। এই ড্রাইভার হিন্দি জানে না; কেবল তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি।

গাড়ি উলটামুখো হতেই ফেলুদা আবার বলল, নাউ ব্যাক টু ম্যাড্রাস-ফাস্ট!

গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে রওনা দেবার পর শুধু একজনই কথা বলল। সে হল নয়ন।

দৈত্যটার বেয়াল্লিশটা দাঁত।

১১. করোমণ্ডলের মোগলাই

বেশ জমিয়ে লাঞ্চ খাওয়া হচ্ছে করোমণ্ডলের মোগলাই ডাইনিং রুম মাইসোরে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল-আজকের খানার পুরো ভার নিয়েছেন লালমোহনবাবু। আসলে তরফদার যে সম্মোহনের জোরে ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাতে-ওঁরই ভাষায়—উনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

খেতে খেতে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, অনেক থ্রিলিং ঘটনার মধ্যে পড়িচি মশাই–থ্যাঙ্কস টু ইউ-কিন্তু আজকেরটা একেবারে ফাইভ-স্টার অভিজ্ঞতা।

দানবের বগলবন্দি হওয়াটা কীভাবে ঘটল, সেটা ফেলুদা আগেই জিজ্ঞেস করেছিল। আর লালমোহনবাবু সেটা বলেওছিলেন। তাঁর ভাষাতেই ঘটনার বর্ণনাটা এখানে দিচ্ছি।

আর বলবেন না, মশাই-আমি তো খোকাকে গপ্পো শোনাতে মশগুল, গুহায় ঢুকছি। আর বেরোচ্ছি, পল্লব-টল্লব মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। একটা গুহায় ঢুকে দেখলুম সামনেই মহিষাসুর। বেরিয়ে আসব, এমন সময় দেখলুম-আরেকটা মূর্তি রয়েছে যেটা বিশাল, বীভৎস। এটার চোখ বোজা, আর মিশকালো রঙের উপর লাল-সাদা ডোরা। মনে মনে ভাবছি—এই ব্যতিক্রমের কারণটা কী?—এও ভাবছি—একি ঘটোৎকচের মূর্তি নাকি?–কারণ মহাভারতের অনেক কিছুই তো এখানে দেখছি। এমন সময় মূর্তিটা চোখ খুলল। ভাবতে পারেন?—ধূমসোটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল!

চোখ খুলেই অবশ্য আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। আমি আর নয়ন দুজনেই ব্যোমকে গেছি, সেই অবস্থাতেই আমাদের দুজনকে বগলদাবা করে নিয়ে দে ছুট!

ফেলুদা মন্তব্য করেছিল যে বোঝাই যাচ্ছে গাওয়াঙ্গির মনটা খুব সরল। এমনকী এও হতে পারে যে, তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই; যা আছে সে শুধু শারীরিক বল। না হলে সুনীল তাকে হিপনোটাইজ করতে পারত না।

তরফদার আর শঙ্করবাবু কোথায় গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করাতে তরফদার বললেন, শঙ্করের হবি হচ্ছে আয়ুর্বেদ। ও শুনেছিল যে, মহাবলীপুরমে সর্পগন্ধা গাছ পাওয়া যায়, তাই আমরা দুজনে খুঁজতে গিয়েছিলাম। গাছ পেয়ে ফিরতি পথে দেখি এই কাণ্ড। সর্পগন্ধা তো ব্লাড প্রেশারে কাজ দেয়, তাই না? বলল ফেলুদা! হ্যাঁ বললেন শঙ্করবাবু! এই সুনীলের প্রেশার মাঝে মাঝে চড়ে যায়। ওর জন্যই এই গাছ আনা।

এর পরেই জটায়ু প্রস্তাব করেন যে তিনি সকলকে খাওয়াবেন। মোগলাই খানার কথাও উনিই বলেন, আর তাতে সকলেই রাজি হয়।

এখন একটুকরো চিকেন টিক্কা কাবাব মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে মুচুকি হেসে বললেন, আপনার প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে গেছে, সেটা আজ প্রমাণ হল।

ফেলুদা ঠাট্টাটাকে খুব একটা আমল না দিয়ে বলল, তার চেয়েও বড় কথা হলি-গাওয়াঙ্গি বাতিল হয়ে গেল।

ইয়েস, বললেন জটায়ু। এখন বাকি শুধু মিস্টার ব্যাস্যাক।

আমাদের সঙ্গে আজ মিঃ রেডিও খাচ্ছেন-অবিশ্যি নিরামিষ। পরশু বড়দিনে তাঁর রোহিণী থিয়েটারে তরফদারের শো শুরু। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে রেডি যে কোনও কার্পণ্য করেননি, সেটা ফেরার পথে রাস্তার দু পাশে তামিল আর ইংরেজি পোস্টার দেখেই বুঝেছি। প্রত্যেকটাতেই জাদুকরের পোশাক পরে তরফদারের ছবি আর সেই সঙ্গে জ্যোতিষ্কম্–ওয়াভার বয়-এর নাম। রেড্ডি জানালেন যে, এর মধ্যেই প্রথম দু দিন হাউসফুল হয়ে গেছে।

আমি বলছি আজ আর কোথাও বেরোবেন না, বললেন মিঃ রেডি। আর কালকের দিনটাও রেস্ট করুন। আপনাদের আজকের এক্সপিরিয়েন্স তো শুনলাম; ওই ছেলেকে নিয়ে আর কোনও রিস্ক নেবেন না। ওর কিছু হলে যারা টিকিট কেটেছে, তারা সবাই টাকা ফেরত চাইবে। তখন কী দশা হবে ভেবে দেখুন। –আমারও, আপনারও। থিয়েটারে অবিশ্যি আমি পুলিশ রাখছি, কাজেই শো-এর সময় কোনও গণ্ডগোল হবে না।

গাওয়াঙ্গির ঘটনার ফলে তরফদার আর শঙ্করবাবু দুজনেই বুঝেছেন যে, নয়নকে সামলানোর ব্যাপারে কোনও গাফিলতি চলবে না। ফেলুদা ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, মহাবলীপুরম দেখে ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল—না হলে আমি কখনওই মিস্টার গাঙ্গুলীর হাতে নয়নকে ছাড়াতাম না। এখন শিক্ষা হয়েছে, এবার থেকে আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।

জটায়ুর গল্প শেষ। তাই নয়ন আজ খাবার পরে তরফদারের সঙ্গে ঘরে চলে গেল।

এখনও যে চমকের শেষ সীমায় পৌঁছইনি, সেটা ঘরে ফেরার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই-অর্থাৎ আড়াইটে নাগাত–প্রমাণ হল।

ফেলুদা আজ রগড়ের মুডে ছিল। জটায়ুকে বলেছিল—এবার থেকে আপনিই সামাল দিন, আমার দিন তো ফুরিয়ে এল-ইত্যাদি। লালমোহনবাবু ব্যাপারটা রীতিমতো উপভোগ করছিলেন, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা মিনিটখানেক ইংরেজিতে কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, চিনলাম না। কিছুক্ষণের জন্য আসতে চায়।

আসতে বললে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ, বলল ফেলুদা। হোটেলে এসেছে, নীচ থেকে ফোন করল। জটায়ু–প্লিজ টেক ওভার।

মানে? লালমোহনবাবুর মুখ হ্যাঁ।

আমার প্রয়োজনীয়তা তো ফুরিয়েই গেছে। দেখাই যাক না আপনাকে দিয়ে চলে কি না।

লালমোহনবাবু কিছু বলার আগেই দরজার বেল বেজে উঠল।

আমি দরজা খুলতে একজন মাঝারি হাইটের বছর-পঞ্চাশের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। মাথার চুল পাতলা এবং সাদা হয়ে এসেছে, তবে গোঁফটা কালো এবং ঘন। ভদ্রলোক এক বার জটায়ু আর এক বার ফেলুদার দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বললেন, আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত, মিঃ মিটার, কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে নয়। হুইচ ওয়ান অফ ইউ ইজ-?

ফেলুদা সরাসরি লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলল, দিস ইজ মিস্টার মিটার।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন লালমোহনবাবুর দিকে। জটায়ু দেখলাম নিজেকে সামলে নিয়েছেন, আর বেশ ভাটের সঙ্গেই হ্যান্ডশেকটা করলেন। মনে পড়ল ফেলুদাই একবার জটায়ুকে বলেছিল—হ্যান্ডশেকটা পুরোপুরি সাহেবি ব্যাপার, তাই ওটা করতে হলে সাহেবি মেজাজেই করবেন, মিনমিনে বাঙালি মেজাজে নয়; মনে রাখবেন-গোরুখোরের গ্রিপ আর মাছখোরের গ্রিপ এক জিনিস নয়।

মনে হয় সেটা মনে রেখেই জটায়ু বেশ শক্ত করে আগন্তুকের হাতটা ধরে দু বার সারা শরীর দুলিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, সিট ডাউন, মিস্টার-

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন, আমার নাম বললে আপনারা চিনবেন না? আমি এসেছি মিঃ তেওয়ারির কাছ থেকে। ওঁর সঙ্গে আমার বহু দিনের আলাপ! এ ছাড়া আমার আর একটা পরিচয় আছে। -আমিও আপনারই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার কোম্পানির নাম ছিল ডিটেকনিক। সাতাশ বছর আগে কলকাতায় এই কোম্পানি স্টার্ট করে। নাইনটিন সিক্সটি এইটে—আজি থেকে বাইশ বছর আগে-আমি বম্বে চলে যাই আমার কোম্পানি নিয়ে। তাই আপনার নাম শুনলেও আপনার চেহারার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। আই অ্যাম সারপ্রাইজড়—কারণ আপনার চেহারা দেখে গোয়েন্দা বলে মনেই হয় না। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার মিটার, বাট ইউ লুক ভেরি অর্ডিনারি। বরং এঁকে-

আগন্তুক ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ঘোরালেন। জটায়ু গলাটা রীতিমতো চড়িয়ে বললেন, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড মিস্টার লালমোহান গ্যাঙ্গুলী, পাওয়ারফুলি আউটস্ট্যান্ডিং রাইটার।

আই, সি।

আপনি কোথাকার লোক?

ভদ্রলোক যা বললেন, তাতে ছাগলের গলায় খাঁড়ার কোপ পড়ার মতো শব্দ হল।

কচ্।

কচ্ছ?

ইয়েস.যাই হোক, যে কারণে আসা...

ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফোটা বার করে জটায়ুর দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি খুব যে কাছে ছিলাম, তা নয়, কিন্তু তাও বুঝতে পারলাম সেটা হিঙ্গোয়ানির ছবি। ।

এই লোকের হয়ে আপনি কাজ করছেন প্রোফেশনালি, তাই না?

ফেলুদা নির্বিকার। জটায়ুর চোখ এক মুহূর্তের জন্য কপালে উঠে নেমে এল। আমাদের ধারণা ফেলুদা যে হিঙ্গোয়ানির হয়ে কাজ করছে সেটা বাইরের কেউ জানে না। ইনি জানলেন কী করে?

তাই যদি হয়, বললেন আগন্তুক, তা হলে আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ, আমি তেওয়ারির দিকটা দেখছি। ওর ব্যাপারটা আমি কাগজে পড়ে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বাইশ বছর পরে আমার হদিস পেয়ে সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কলকাতায় থাকতে আমি ওকে অনেক ব্যাপারে হেলপ করি, সেটা ও ভোলেনি। বলল—আই নিড় ইওর হেল্প এগেন। –আমি রাজি হই, আর তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। প্রথমেই হিঙ্গোয়ানির বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি, ও কলকাতায় নেই। ওর এক ভাইপো ফোন ধরেছিল; বলল-আঙ্কল কোথায় যাচ্ছেন তা বলে যাননি। –আমি এয়ারলাইনসে খোঁজ করে ম্যাড্রাসের প্যাসেঞ্জার লিস্টে ওর নাম পাই। বুঝতে পারি, তেওয়ারির শাসনির ফলে সে ভয়ে চম্পট দিয়েছে। এর পর আমি ওর বাড়িতে যাই। ওর বেয়ারার কাছে জানতে পারি যে ক'দিন আগে তিনজন বাঙালি হিঙ্গোয়ানির সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাদের একজনের নাম মিত্তর। আমার সন্দেহ হয়। আমি ডাইরেক্টরি থেকে আপনার নম্বর বার করে ফোন করি। একজন সার্ভেন্ট ফোন ধরে বলে যে, আপনি ম্যাড্রাস গেছেন। আমি দুয়ে দুয়ে চার হিসেব করে ম্যাড্রাস যাওয়া স্থির করি। কাল এখানে এসেই ফোনে সব হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, হিঙ্গোয়ানি করোমণ্ডলে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করি। -মিটার বলে আছেন। কেউ?–উত্তর পাই, হ্যাঁ আছেন; পি. মিটার। তখনই স্থির করি, আপনার সঙ্গে দেখা করে লেটেস্ট সিচুয়েশনটা জানাব। এটা আপনি স্বীকার করছেন তো যে, হিঙ্গোয়ানি আপনাকে অ্যাপিয়েন্ট করেছে তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য?

এনি। অবজেকশন?

মোনি।

আমরা তিনজনেই চুপ। ফেলুদা কিন্তু মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়ছে, দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই তার মনে কী আছে।

তেওয়ারির সিন্দুকের ঘটনা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, জানেন? বললেন আগন্তুক।

কলকাতার কাগজে বেরিয়েছে কি? জটায়ুর প্রশ্ন।

ইয়েস। সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। এতে কেসটার চেহারাটাই পালটে যায়। কাগজ পড়েই আমি তেওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করি। আপনি যাঁর প্রাণরক্ষার ভার নিয়েছেন তিনি কেমন লোক জানেন? হি ইজ এ থিফ, স্কাউণ্ডেল অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান লায়ার।

ভদ্রলোক শেষের কথাগুলো বললেন ঘর কাঁপিয়ে। জটায়ু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁর কথায় আতঙ্কের রেশ ঢাকতে পারলেন না।

হা-হাউ ঢু ইউ নোহে?

তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। হিঙ্গোয়ানি তেওয়ারির সিন্দুক থেকে পাঁচ লক্ষের উপর টাকা চুরি করেছে। সিন্দুকের তলা থেকে হিঙ্গোয়ানির আংটি পাওয়া গেছে-পালা বসানো সোনার আংটি। ওর আপিসের প্রত্যেকে ওই আংটি চিনেছে। আংটিটা গড়িয়ে একেবারে পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। তাই এতদিন বেরোয়নি। পরশু বেয়ার মেঝে সাফ করতে গিয়ে পায়। এটাই হচ্ছে আমার রঙের তুরুপ। দিস উইল ফিনিশ হিঙ্গোয়ানি।

কিন্তু যখন চুরিটা হয় তখন তো হিঙ্গেরাজ-থুড়ি, হিঙ্গোয়ানি-আপিসে ছিলেন না।

ননসেন্স গর্জিয়ে উঠলেন ডিটেকটিভ। হিঙ্গোয়ানি চুরিটা করে মাঝরাত্তিরে, আপিস টাইমে নয়। গোয়েঙ্কা বিল্ডিং-এ টি এইচ সিন্ডিকেটের আপিস। সেই বিল্ডিং-এর দারোয়ানকে পাঁচশো টাকা ঘুষ দিয়ে হিঙ্গোয়ানি আপিসে ঢেকে রাত দুটোয়। এ কথা দারোয়ান পুলিশের দাবিড়ানিতে স্বীকার করেছে। সিন্দুকের কম্বিনেশন তেওয়ারি হিঙ্গোয়ানিকে বলেছিল, সেটা তেওয়ারির এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে। প্রায় বছর পনেরো আগে তেওয়ারির জনডিস হয়, হাসপাতালে ছিল, খুব খারাপ অবস্থা। হিঙ্গোয়ানি তখন তার পার্টনার আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু! বন্ধুকে ডেকে তেওয়ারি বলে, আমি মরে গেলে আমার সিন্দুক কী করে খোলা হবে? হিঙ্গোয়নি ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তেওয়ারি জোর করে তাকে নম্বরটা নোট করে নিতে বলে। হিঙ্গোয়ানি সে অনুরোধ রাখে।

কিন্তু হিঙ্গোয়ানি হঠাৎ টাকা চুরি করবে। কেন?

কারণ ওর পকেট ফাঁক হয়ে আসছিল, গলা সপ্তমে তুলে বললেন আগন্তুক। শেষ বয়সে জুয়ার নেশা ধরেছিল! প্রতি মাসে একবার করে কাঠমাণ্ডু যেত। ওখানে জুয়ার আড়ত ক্যাসিনো আছে জানেন তো? সেই ক্যাসিনোতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছে রুলেটে। তেওয়ারি ব্যাপারটা জেনে যায়। হিঙ্গোয়ানিকে অ্যাডভাইস দিতে যায়। হিঙ্গোয়ানি খেপে ওঠে। এমন দশা হয়েছিল। লোকটার যে, বাড়ির দামি জিনিসপত্র বেচিতে শুরু করে। শেষে মরিয়া হয়ে পার্টনারের সিন্দুকের দিকে চোখ দেয়।

আপনি কী করবেন স্থির করেছেন।

তোমাদের এখান থেকে আমি তার ঘরেই যাব। আমার বিশ্বাস, চুরির টাকা তার সঙ্গেই আছে। তেওয়ারি কেমন মানুষ, জানেন?–সে বলেছে, তার টাকা ফেরত পেলে সে তার পুরনো পার্টনারের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না। এই খবরটা আমি হিঙ্গোয়ানিকে জানাব-তাতে যদি তার চেতনা হয়।

আর যদি না হয়?

ভদ্রলোক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে একটা ক্রুর

হাসি হেসে বললেন, সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

আপনি গোয়েন্দা হয়ে আ-আইন-বিরুদ্ধ কাজ—?

ইয়েস, মিস্টার মিটার! গোয়েন্দা শুধু এক রকমই হয় না, নানা রকম হয়। আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি। এটা কি আপনি জানেন না যে, গোয়েন্দা আর ক্রিমিন্যালে প্রভেদ সামান্যই?

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। আবার জটায়ুর সঙ্গে জবরদস্ত হ্যান্ডশেক করে—গ্ল্যান্ড টু মিট ইউ, মিস্টার মিটার। গুড ডে। বলে গাটগটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা তিনজন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ফেলুদাই প্রথম কথা বলল।

থ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাবু। মীন থাকার সুবিধে হচ্ছে যে, চিন্তার আরও বেশি সময় পাওয়া যায়। কোনও একটা ব্যারামে—হয়তো ডায়াবেটিস—হিঙ্গোয়ানি রোগ হয়ে যাচ্ছিলেন। তাই সেদিন বারবার কবজি থেকে ঘড়ি নেমে যাওয়া, আর চুরির সময় আঙুল থেকে আংটি খুলে যাওয়া।

আপনি কি তা হলে ওই গোয়েন্দার কথা বিশ্বাস করছেন?

করছি, লালমোহনবাবু, করছি। অনেক ব্যাপার, যা ধোঁয়াটে লাগছিল, তা ওর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে হিঙ্গোয়ানি টাকা চুরি করে অর্থাভাব মেটানোর জন্য নয়; সে কাঠমাণ্ডুতে জুয়া খেলে যতই টাকা খুইয়ে থাকুক, নয়নকে পেয়ে সে বোঝে, তার সব সমস্যা মিটে যাবে। সে টাকা চুরি করে মিরাকলস আনলিমিটেড কোম্পানিকে দাঁড় করানোর জন্য, তরফদারকে ব্যাক করার জন্য।

তা হলে এখন আপনি হিঙ্গোয়ানির সঙ্গে দেখা করবেন না?

তার তো কোনও প্রয়োজন নেই! যিনি দেখা করবেন। তিনি হলেন ডিটেকনিকের এই গোয়েন্দা। হিঙ্গোয়ানিকে তেওয়ারির টাকা বাধ্য হয়েই এই গোয়েন্দার হাতে তুলে দিতে হবে-প্রাণের ভয়ে। কাজেই তরফদারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

তা হলে এখন...?

এইখানেই দাঁড়ি দিন, লালমোহনবাবু। এর পরে যে কী, তা আমি নিজেই জানি না।

১২. সমুদ্রের ধারে

জটায়ু আর আমার পিছনে যেহেতু কেউ লাগেনি, বিকেলে আমরা দুজনে সমুদ্রের ধারে গেলাম হাওয়া খেতে; হিঙ্গোয়ানির কপালে কী আছে জানি না, তবে এটা মনে হচ্ছে যে, নয়নের আর কোনও বিপদ নেই। যদি তেওয়ারির টাকা ফেরত দিয়েও হিঙ্গোয়ানির কাছে বেশ কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তরফদারের শো হতে কোনও বাধা নেই। আর প্রথম শো থেকেই তো টিকিট বিক্রির টাকার অংশ আসতে শুরু করবে। মনে হয় হিঙ্গোয়ানি এখনও বেশ কিছু দিন চালিয়ে যাবেন।

জটায়ুকে বলতে তিনি চোখ রাঙিয়ে বললেন, তপশ, আই অ্যাম শকড়। লোকটা একটা ক্রিমিনাল, পরের সিন্দুক থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়েছে, আর সে লোক নয়নকে ভাঙিয়ে খাবে, এটা ভেবে তুমি খুশি হচ্ছে?

খুশি নয়, লালমোহনবাবু। হিঙ্গোয়ানির বিরুদ্ধে যা প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে তো তাকে এই মুহূর্তে জেলে পোরা যায়। কিন্তু তার পার্টনার যদি পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে তার উপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে রেহাই দেন-তাতে আমার-আপনার কী বলার আছে?

লোকটা জুয়াড়ি—সেটা ভুলো না। আমার অন্তত কোনও সিমপ্যাথি নেই হিঙ্গোয়ানির উপর।

তেষ্টা পাচ্ছিল দুজনেরই। লালমোহনবাবু কোল্ড কফি খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এখানকার কফিটা একটা প্লাস পয়েন্ট সেটা স্বীকার করতেই হবে।

সমুদ্রের কাছেই একটা কাফে আবিষ্কার করে আমরা একটা টেবিল দখল করে বেয়ারাকে কোল্ড কফি আড়ার দিলাম। কাফেতে অনেক লোক, বুঝলাম। এদের ব্যবসা ভালই চলে।

মিনিটখানেকের মধ্যে ঠকঠক করে দুটো গেলাস এসে পড়ল আমাদের টেবিলের উপর। আমরা দুজনেই ঘাড় নিচু করে প্লাস্টিকের স্ট্রয়ের ডগা ঠোঁটের মধ্যে পুরে দিলাম।

হ্যাভ ইউ টোল্ড ইয়োর টিকটিকি ফ্রেন্ড?

লালমোহনবাবু একটা বিশ্রী শব্দ করে বিষম খেলেন।

মুখ তুলেই দেখি টেবিলের উলটাদিকে চকুরা-বকরা হাওয়াইয়ান শার্ট পরে দণ্ডায়মান মিস্টার নন্দলাল বসাক।

লালমোহনবাবু সামলে নিতে ভদ্রলোক বললেন, শুধু এইটে বলে দেবেন। মিত্তিরকে এবং তরফদারকে যে, নন্দ বসাক পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না। পাঁচিশে ডিসেম্বর যদি শো হয়, তা হলে সেই শো থেকে শেষের আইটেমটি বাদ যাবে, এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।

আমাদের পাশেই কাফের দরজা। ভদ্রলোক কথাটা বলেই সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে অন্ধকার, তাই তিনি যে কোনদিকে গেলেন সেটা বুঝতেই পারলাম না।

তেষ্টা মেটেনি, তাই কফিটা শেষ করে দাম চুকিয়ে আমরা আর দশ মিনিটের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলমুখে রওনা হলাম।

হোটেলে পৌঁছতে লাগল আধঘণ্টা। ভিতরে ঢুকে দেখি লবি লোকে লোকারণ্য। শুধু লোক নয়, তার সঙ্গে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড় করানো অজস্র লাগেজ। বাঝাই যাচ্ছে, একটা বিদেশি টুরিস্ট দল সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে। ফেলুদাকে বসাকের খবরটা এক্ষুনি দিত হবে, তাই আমরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে লিফটে ঢুকে চার নম্বর বাতামটা টিপে দিলাম।

চারশো তেত্রিশের সামনে গিয়েই বুঝলাম, ঘরে ফেলুদা ছাড়াও অন্য লোক আছে, আর বেশ গলা উচিয়ে কথাবাতা হচ্ছে।

বেল টেপার প্রায় পনেরো সেকেন্ড। পরে দরজা খুলল ফেলুদা, আর আমাকে সামনে পেয়েই এক রামধমক।

দরকারের সময় না পাওয়া গেলে তোরা আছিস কী করতে?

কাঁচুমাচু ভাবে ঘরে ঢুকে দেখি, মাথায় হাত দিয়ে কাউচে বসে আছেন সুনীল তরফদার।

ব্যাপারটা কী মশাই? ভয়ে ভয়ে শুধোলেন জটায়ু।

সেটা ঐন্দ্রজালিককে জিজ্ঞেস করুন, শুকনো গভীর গলায় বলল ফেলুদা।

কী মশাই?

আমিই বলছি। বলল ফেলুদা। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোবে না। খচু করে লাইটার দিয়ে ঠোঁটে ধরা চারমিনারটা জ্বলিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফেলুদা বলল, নয়ন হাওয়া। কিড়নাপড়। ভাবতে পারিস? এর পরেও ফেলু মিত্তিরের মান-ইজ্জত থাকবে? পই পই করে বলে দিয়েছিলাম ঘর থেকে যেন না বেরোয়, নয়ন যেন ঘর থেকে না বেরোয়। –আর এই ভর সন্ধেবেলা-গিজগিজ করছে লবি, তার মধ্যে শঙ্করবাবু নয়নকে নিয়ে গেছেন বুকশপে।

তারপর?—আমার বুকের ধুকপুকুনি আমি কানে শুনতে পাচ্ছি।

বাকিটা বলে চমকদার মশাই, বাকিটা বলো! নাকি এই কাজটাও আমার উপর ছাড়তে হবে?

ফেলুদাকে এত রাগতে আমি অনেকদিন দেখিনি।

তরফদার হেঁট মাথা অনেকটা তুলে চাপা গলায় বললেন, নয়ন এক ঘরে বসে অস্থির হয়ে পড়ে বলে শঙ্কর ওর জন্য গল্পের বই কিনতে গিয়েছিল। বই পেয়েও ছিল। দোকানের মেয়েটি দুটো বই প্যাক করে ক্যাশ মেমো করে দিচ্ছিল-শঙ্কর তাই দেখছিল। হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে-দ্যাট বয়? হায়্যার ইজ দ্যাট বয়?-শঙ্কর পিছন ফিরে দেখে নয়ন নেই; ও তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে বেরিয়ে লবিতে খোঁজে, নয়নের নাম ধরে ডাকে, একে-ওকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কোনও ফল হয় না। লবিতে এত ভিড়–তার মধ্যে একজন ন বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে...

এটা কখনকার ঘটনা?

সেখানেই বলিহারি! চেঁচিয়ে উঠল ফেলুদা! দেড় ঘণ্টা আগে ব্যাপারটা ঘটেছে, আর সুনীল এই সবে দশ মিনিট হল এসে আমাকে রিপোর্ট করছে। –হুঁ!

বসাক, বললেন জটায়ু। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।

আপনি দেখি ভয়ংকর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কালছেন কথাটা।

আমি কাফের ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। ফেলুদা গম্ভীর।

আই সি...আমি এটাই আশঙ্কা করেছিলাম। অর্থাৎ কুকীর্তিটা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তোদের সঙ্গে দেখা হয়। হুঁ...

শঙ্করুবাবু কোথায়? জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

তরফদার মাথা না তুলেই বলল, থানায়।

শুধু পুলিশে খবর দিলে তো চলবে না, বলল ফেলুদা, তোমার পৃষ্ঠপোষক আছে, তোমার থিয়েটারের মালিক আছেন। তিনি কি নয়ন ছাড়া শো করতে রাজি হবেন? আই হ্যাভ গ্রেট ডাউটস।

তা হলে হিঙ্গোয়ানিকে...

জটায়ু একবার ফেলুদার, একবার তরফদারের দিকে চাইলেন।

তাঁকে খবর দেবার সাহস নেই। এই সম্মোহক প্রবারের। বলছে—আপনি কাইন্ডলি কাজটা করে দিন, মিস্টার মিত্তির! আমি গেলে সে লোক আমাকে টুটি টিপে মেরে ফেলবে।

শুনুন— লালমোহনবাবু হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠলেন—আপনারও যেতে হবে না, সুনীলবাবুরও যেতে হবে না। আমরা যাচ্ছি। —কী তপেশ, রাজি তো?

ফেলুদা ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট আর কপালে ভ্রূকুটি নিয়ে সোফায় বসে পড়ে বলল, যেতে হলে এখনই যান। তোপ্‌সে, তুই ইংরেজিতে হেলপ করিস।

হিঙ্গোয়ানির ঘরের নম্বর দুশো আটাশি। আমরা সিঁড়ি দিয়েই নেমে গিয়ে তাঁর দরজায় বেল টিপলাম।

দরজা খুলল না।

সময়-সময় এই বেলগুলো ওয়র্ক করে না, বললেন জটায়ু। এবার বেশ জোরে চাপ দিয়ে তো।

আমি বললাম, ভদ্রলোকের তো বেরোবার কথা না। ঘুমোচ্ছেন নাকি?

তিনবার টেপাতেও যখন ফল হল না, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে লবিতে গিয়ে হাউস টেলিফোনে ২৮৮ ডায়াল করতে হল।

ফোন বেজেই চলল। নো রিপ্লাই।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু রিসেপশনে গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করতে। তারা বলল—মিঃ হিঙ্গোয়ানি নিশ্চয়ই ঘরেই আছেন। কারণ, তাঁর চাবি এখানে নেই।

এবার জটায়ুর মুখ দিয়ে তোড়ে ইংরিজি বেরোল, ভাষা টেলিগ্রামের।

বাট ইম্পর্ট্যান্ট সি হিঙ্গোয়ানি-ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। নো ডুপ্লিকেট কি? নো ডুপ্লিকেট কি?

কাজটা খুব খুশি মনেই করে দিল রিসেপশনের লোকেরা।

চাবি হাতে বয়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা লিফটে দোতলায় উঠে আবার হিঙ্গোয়ানির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ইয়েল লক চাবি ঘোরাতেই খড়াৎ করে খুলে গেল, বয় দরজা ঠেলে দিল, আমি বললাম থ্যাঙ্ক ইউ, জটায়ু আমার আগেই ঘরে ঢুকে তৎক্ষণাৎ তড়াক করে পিছিয়ে আমারই সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। তার পর অদ্ভুত স্বরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিন টুকরো কথা বেরোল।

হিং-হিং-হিক।

ততক্ষণে আমিও ভিতরে ঢুকে গেছি, আর দৃশ্য দেখে এক নিমেষে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

খাটের উপর চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মিঃ হিঙ্গোয়ানি। তাঁর পা দুটো অবিশ্যি নীচে নেমে মেঝের কার্পেটে ঠেকে আছে। তাঁর গায়ে যে লাল নীল সাদা আলোর খেলা চলেছে, সেটার কারণ হচ্ছে বাঁয়ে টেবিলের

উপর রাখা টিভি-যেটাতে হিন্দি ছবি চলেছে, যদিও কোনও শব্দ নেই। ভদ্রলোকের বোতাম খোলা জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সাদা শার্টের উপর ভেজা লাল ছোপ, আর তার মাঝখানে উঁচিয়ে আছে একটা ছোরার হাতল।

১৩. ফেলুদা পুলিশকে জানিয়েছে

হিঙ্গোয়ানিকে যে ডিটেকনিকের গোয়েন্দাই খুন করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ পুলিশের ডাক্তার নানা পরীক্ষা করে বলেছেন খুনটা হয়েছে আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। গোয়েন্দা ভদ্রলোক আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন পৌনে তিনটে নাগাত–আমাকে তিনি নিজেই বলেছিলেন সোজা যাবেন হিঙ্গোয়ানির ঘরে। এও বোঝা যাচ্ছে যে, হিঙ্গোয়ানি তেওয়ারির টাকা ফেরত দিতে রাজি হননি। তাই গোয়েন্দা তার কথামতো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছেন। বেডসাইড টেবিলের উপর খুচরো পয়ষট্টি পয়সা ছাড়া এক কপর্দকও পাওয়া যায়নি হিঙ্গোয়ানির ঘরে। একটা সুটকেস ছাড়া আর কোনও মাল ঘরে ছিল না। টাকা নিশ্চয়ই একটা ব্রিফকেস জাতীয় ব্যাগে ছিল; তার কোনও চিহ্ন আর নেই।

ফেলুদা পুলিশকে জানিয়েছে যে আততায়ী যদি টাকা নিয়ে থাকে, তা হলে সে-টাকা সে কলকাতায় গিয়ে টি. এইচ, সিন্ডিকেটের মিঃ দেবকীনন্দন তেওয়ারির হাতে তুলে দেবে। এই খবরটা কলকাতার পুলিশকে জানানা দরকার।

ফেলুদাকে হত্যাকারীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলতে হল যে, লোকটার নাম তার জানা নেই। —শুধু এটুকু বলতে পারি সে সম্ভবত কচ্ছ প্রদেশের লোক।

মিঃ রেড্ডি খবর পেয়েই চলে এসেছিলেন, আর এখন আমাদের ঘরেই বসেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম। তিনি ব্যাপারটা জেনে মুছা যাবেন। তার বদলে দেখলাম নয়ন ছাড়াও কী ভাবে শোটাকে জমানো যায় তিনি সেই কথা ভাবছেন। বোঝাই যায়। ভদ্রলোকের তরফদারের উপর একটা মায়া পড়ে গেছে। বললেন, শো বন্ধ না করে যদি আপনার হিপূনাটিজম-এর আইটেমটা ডবল করে দেওয়া যায়? আমি ম্যাড্রাসের লিডিং ফিল্ম স্টারস, ডানসারস, সিঙ্গারসকে ডাকব ওপনিং নাইটে। আপনি তাদের এক এক করে স্টেজে ডেকে বুদ্ধ বানিয়ে দিন। কেমন আইডিয়া?

তরফদার মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শুধু আপনার ওখানে খেলা দেখিয়ে তো আমার চলবে না! আমি জানি নয়নের খবর ছড়িয়ে গেছে। সব ম্যানেজার তো আপনার মতো নয়, মিঃ রেডি!!–তাদের বেশির ভাগই কড়া ব্যবসাদার। নয়ন ছাড়া তারা আমাকে বুকিং-ই দেবে না। ..একসঙ্গে দুটো দুর্ঘটনা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

ফেলুদা তরফদারকে জিজ্ঞেস করল, হিঙ্গোয়ানি কি তোমাকে অলরেডি কিছু পেমেন্ট করেছেন?

কলকাতায় থাকতে কিছু দিয়েছিলেন; তাতে আমাদের যাতায়াতের খরচ হয়ে যায়। একটা বড় কিস্তি আগামী কাল দেবার কথা ছিল। উনি দিনক্ষণ দেখে এসব কাজ করতেন। আগামীকাল নাকি দিন ভাল ছিল।

মিঃ রেডি কাহিল। বললেন, তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। এই মন নিয়ে তোমার পক্ষে শো করা অসম্ভব।

শুধু আমি না, মিঃ রেডি। আমার ম্যানেজার শঙ্কর এমন ভেঙে পড়েছে যে, সে শয্যা নিয়েছে। তাকে ছাড়াও আমার চলে না।

পুলিশ আধঘণ্টা হল চলে গেছে। তারা খুনের তদন্তই করবে; মাদ্রাজের বিভিন্ন হোটেল, লজ, ধরমশালায় খোঁজ নেবে। আমাদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন চেহারার কোনও লোক গত দু দিনের মধ্যে সেখানে এসে উঠেছে কি না! হিঙ্গোয়ানির ভাইপো মোহনকে টেলিফোন করা হয়েছিল। সে আগামীকাল এসে লাশ শনাক্ত করে সৎকারের ব্যবস্থা করবে। মৃতদেহ এখন মর্গে রয়েছে। পুলিশ এও জানিয়েছে যে, ছারার হাতলে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। নয়নের ব্যাপারে ফেলুদা বলল যে, সে নিজেই তদন্ত করবে। তাতে তরফদার সায় দিয়েছেন।

রেড্ডি এবার চেয়ার থেকে উঠে ফেলুদাকে বললেন, আমি কিন্তু আপনার উপরই ভরসা। করে আছি, মিঃ মিত্তির। দুদিন যদি শো পোস্টপোন করতে হয় তা আমি করব। এই দুদিনের মধ্যে আপনি জ্যোতিষ্কমকে খুঁজে বার করে দিন—প্লিজ!

রেড্ডি যাবার মিনিটখানেকের মধ্যে তরফদারও উঠে পড়ে বললেন, দুদিন দেখি। তার মধ্যে যদি নয়নকে না পাওয়া যায় তা হলে কলকাতায় ফিরে যাব। আপনি কি আরও কিছু দিন থাকবেন?

অনির্দিষ্টকাল থাকা অবশ্যই সম্ভব নয়, বলল ফেলুদা। তবে এইভাবে চোখে ধুলো দেওয়াটাও মেনে নেওয়া মুশকিল। দেখি...

তরফদার বেরিয়ে যাবার পর ফেলুদা হাতের সিগারেটে একটা শেষ টান দিয়ে তার খুব চেনা গলায় একটা চেনা কথা মৃদুস্বরে তিনবার বলল—খট্‌কা...খট্‌কা...খট্‌কা...

এটা আবার কীসের খটকা? জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

হিঙ্গোয়ানিকে বলা ছিল যে, অচেনা লোক হলে সে যেন দরজা না খোলে; তা হলে ডিটেকনিক ঢুকলেন কী করে? তাকে কি হিঙ্গোয়ানি আগে থেকেই চিনতেন?

কিছুই আশ্চর্য নয়, বললেন জটায়ু। হিঙ্গোয়ানি কতরকম ব্যাপারে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল ভেবে দেখুন।

আমি ফেলুদাকে একটা কথা না বলে পারলাম না।

তুমি কি শুধু হিঙ্গোয়ানি মাডারের কথাই ভাবিছ, ফেলুদা? আমার কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে যে একটা বাজে লোক যদি খুন হয়েও থাকে, তাতে যতটা ভাবনা হয়, তার চেয়ে নয়নের মতো ছেলে চুরি যাওয়াটা অনেক বেশি ভাবনার। তুমি হিঙ্গোয়ানি ভুলে গিয়ে এখন শুধু নয়নের কথা ভাবো।

দুটোই ভাবছি রে তোপ্‌সে, কিন্তু কেন জানি মনের মধ্যে দুটো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

এ আবার কী হেঁয়ালি মশাই? লালমোহনবাবু বেশ বিরক্তভাবে বললেন। দুটো তো সেপারেট ঘটনা—জট পাকাতে দিচ্ছেন কেন?

ফেলুদা জটায়ুর কথায় কান না দিয়ে বার দু-তিন মাথা নেড়ে বলল, নো সাইন অফ স্ট্রাগল...নো সাইন অফ স্ট্রাগল...

সে তো শুনলুম, বললেন জটায়ু। পুলিশ তো তাই বলল।

অথচ লোকটা যে ঘুমের মধ্যে খুন হয়েছে তা তো নয়?

তা হবে কেন? জুতো মোজা পরে কেউ ঘুমোয় নাকি?

তা অনেক মাতাল ঘুমোয় বইকী—কারণ তাদের হুঁশ থাকে না।

কিন্তু এর ঘরে তো ড্রিঙ্কিং-এর কোনও চিহ্ন ছিল না। —অবিশ্যি যদি বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসে দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে...

উঁহু।

হোয়াই নট?

টিভি খোলা ছিল, যদিও ভলুম একেবারে নামানো ছিল। তা ছাড়া অ্যাশট্রের খাঁজেতে একটা আধখানা সিগারেট পুরোটা ছাই হয়ে পড়ে ছিল। অর্থাৎ ভদ্রলোক টিভি দেখতে দেখতে সিগারেট খাচ্ছিলেন, সেই সময় দরজার বেলটা বাজে। হিঙ্গোয়ানি টিভির ভল্যুম পুরো নামিয়ে দিয়ে সিগারেটটা ছাইদানের কানার খাঁজে রেখে উঠে গিয়ে দরজা খোলেন।

খোলার আগে কি জিজ্ঞেস করবেন না কে বেল টিপল?

হ্যাঁ, কিন্তু চেনা গলা হলে তো আর দ্বিধার কোনও কারণ থাকে না।

তা হলে ধরে নিন যে হিঙ্গোয়ানির সঙ্গে এই গোয়েন্দার আলাপ ছিল, এবং হিঙ্গোয়ানি তাকে অসৎ লোক বলে জানতেন না।

কিন্তু সেই লোক যখন ছুরি বার করবে। তখন হিঙ্গোয়ানি বাধা দেবেন না? ষ্ট্রাগল হবে না?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কী ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব সেটা আপনি ভেবে বের করবেন। যদি না পারেন, তা হলে বুঝতে হবে আপনার পাঠকদের অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। কোথায় গেল। আপনার আগের সেই জৌলুস? সেই ক্ষুরধার—

চুপ!

লালমোহনবাবুকে ব্রেক কষতে হল।

ফেলুদা আমাদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে এখন দেয়ালের দিকে চেয়ে-চোখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে গভীর খাঁজ।

আমি আর জটায়ু প্রায় এক মিনিট কথা বন্ধ করে ফেলুদার এই নতুন চেহারাটা দেখলাম। তারপর আমাদের কানে এল কতকগুলো কথা-ফিসফিসিয়ে বলা–

বু-ঝে-ছি! -কিন্তু কেন, কেন, কেন?

দশ-বারো সেকেন্ড নৈঃশব্দের পর লালমোহনবাবুর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আপনি একটু একা থাকতে চাইছেন কি?

থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার গাঙ্গুলী। আধঘণ্টা, আধঘণ্টা একা থাকতে চাই।

আমরা দুজনে উঠে পড়লাম।

১৪. কফি শপে গিয়ে চা খাওয়া

আমার মনে যে ইচ্ছেটা ছিল, সেটা দেখলাম লালমোহনবাবুর ইচ্ছের সঙ্গে মিলে গেছে। সেটা হল নীচে কফি শপে গিয়ে চা খাওয়া।

আমরা কফি শাপে গিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। সঙ্গে স্যান্ডউইচ হলে মন্দ হত না, বললেন জটায়ু। শুধু চা বড় চট করে ফুরিয়ে যাবে। আধ ঘণ্টা কাটাতে হবে তো! বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল; চায়ের সঙ্গে দু প্লেট চিকেন স্যান্ডউইচ যোগ করে দিলাম।

আসার আগে আঁচ পেয়েছি যে ফেলুদা আলোর সন্ধান পেয়েছে; সেটা কম কি বেশি। জানি না, কিন্তু বুঝতে পারছি যে শিরদাঁড়া দিয়ে ঘন ঘন শিহরন বয়ে যাচ্ছে।

হাতে সময় আছে। তাই লালমোহনবাবু তাঁর সবে-মাথায়-আসা উপন্যাসের আইডিয়াটা শোনালেন। যথারীতি গল্পের নাম আগেই ঠিক হয়ে গেছে। মাথুরিয়ায় রোমাঞ্চ। বললেন, চায়ন সম্বন্ধে একটু পড়ে নিতে হবে। অবিশ্যি আমার এ গল্পে আজকের চিনের চেহারা পাওয়া যাবে না; এ হবে ম্যান্ডারিনদের আমলের চায়না।

খাওয়া শেষ, লালমোহনবাবুর গল্প শেষ, তাও দেখি দশ মিনিট সময় রয়েছে।

কফি শপ থেকে লবিতে বেরিয়ে এসে জটায়ু বললেন, কী করা যায়, বলে তো!

আমি বললাম, আমার ইচ্ছে করছে একবার বুক শপটাতে ঢুঁ মারি। ওটা তো এখন আমাদের কাছে একটা হিস্টোরিক জায়গা-নয়ন তো ওখান থেকেই অদৃশ্য হয়েছে।

গুড আইডিয়া। আর বলা যায় না-হয়তো গিয়ে দেখব। আমার বই ডিসপ্লে করা:

হয়েছে।

ইডলি দোসার দেশে আপনার বই থাকবে না, লালমোহনবাবু।

দেখি না খোঁজ করে!

দোকানের ভদ্রমহিলার বয়স বেশি না, আর দেখতেও সুশ্রী! জটায়ু এক্সকিউজ মি বলে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ইয়েস স্যার?

ডু ইউ হ্যাভ ক্রাইম নভেলস ফর-ইয়ে, কী বলে-কিশোরস?

কিশোরস? ভদ্রমহিলার ভুরু কুঁচকে গেছে।

ফর ইয়াং পিপল, বললাম আমি।

ইন হোয়াট ল্যাংগুয়েজ?

বাংলি-আই মিন, বেঙ্গলি।

নো, স্যার। নো বেঙ্গলি বুকস। স্যরি। বাট উই হ্যাভ লট্‌স অফ চিলড্রেনস্ বুকস ইন ইংলিশ।

জানি। আই নো।

তার পর একটু হেসে ফাস্ট গিয়ার দিয়ে আরম্ভ করলেন, টুডে-মানে, দিস আফটারনুন, এ ফ্রেন্ড...ইয়ে...নু

বুঝলাম সেকেন্ড গিয়ারে গাড়ি আটকে গেছে। আমাকেই বলে দিতে হল যে, আজই বিকেলে আমাদের এক বন্ধু এই দোকান থেকে দুটো ইংরিজি চিলড্রেনস বুক্‌স কিনে নিয়ে গেছে।

দিস আফটারনুন?

ইয়েস? বললেন জটায়ু। নো?

নো, স্যার।

নো।

ভদ্রমহিলা বললেন। গত চার দিনের মধ্যে কোনও ছোটদের বই তিনি বিক্রি করেননি। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমার বুকে ধুকপুকুনি। ধরা গলায় বললাম, দশ মিনিট হয়ে গেছে, লালমোহনবাবু।

ভদ্রমহিলাকে একটা থ্যাঙ্ক ইউ জানিয়ে আমরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে লিফটে উঠলাম। বোতাম টিপে খসখসে গলায় জটায়ু বললেন, এ যে বিচিত্র সংবাদ।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, কারণ আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

চাবি ঘুরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে দুজনেই একসঙ্গে কথা বলে ফেললাম।

ও মশাই-!

ফেলুদা!

ওয়ান অ্যাট এ টাইম—ফেলুদার গলায় ধমকের সুর।

আমি বললাম, আমি বলছি। —শঙ্করবাবু বইয়ের দোকানে যাননি।

টাট্‌কা কিছু থাকে তো বল। এটা বাসি খবর।

আপনি জানেন?

আমি সময়ের অপব্যবহার করি না, লালমোহনবাবু। বইয়ের দোকানে প্রায় বিশ মিনিট আগেই হয়ে এসেছি। মিস স্বামীনাথনের সঙ্গে কথা বলেছি। খবরটা আপনাদের দিতে গিয়ে দেখলাম, আপনারা গোগ্রাসে স্যান্ডউইচ গিলছেন; তাই চলে এলাম।

কিন্তু তা হলো–? আমার অসমাপ্ত প্রশ্ন।

তরফদার আসছে। এক্ষুনি ফোন করেছিল। বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। দেখি কী বলে।

দরজায় ঘণ্টা।

তরফদার, মুখ চুন।

আমায় বাঁচান, ফেলুবাবু! হাহাকার করে উঠলেন ভদ্রলোক!

কী হল?

শঙ্কর। ওর ঘরে গোল্লাম। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আমার বিপদের কি আর শেষ নেই?

ফেলুদার কাছ থেকে এই প্রশ্নের এক অদ্ভুত উত্তর এল।

না, সুনীল তরফদার; এই সবে শুরু।

মানে? চেরা গলায় বলে উঠলেন তরফদার।

মানে অত্যন্ত সহজ, সুনীল। তুমি এখনও নিরপরাধের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ; এ পোশাক তোমাকে মানায় না, সুনীল। তুমি যে ঘোর অপরাধী!

মিস্টার মিত্তির, আমাকে এই ধরনের কথা বলার কোনও অধিকার নেই আপনার।

কী বলছি সুনীল? গোয়েন্দা অপরাধীকে ধরে ফেললে তার উপর দোষারোপ করবে না? তুমি এই যে এলে আমার ঘরে, এখান থেকে সোজা চলে যাবে পুলিশের হাতে। তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

আমার অপরাধটা কী, সেটা জানতে পারি?

নিশ্চয়ই। এক, তুমি হত্যাকারী ; দুই, তুমি চোর। সে কথাই আমি পুলিশকে বোঝাব।

আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনি প্রলাপ বকছেন।

মোটেই না। হিঙ্গোয়ানি চেনা লোক ছাড়া আর কারুর জন্য দরজা খুলবেন না এটা তিনি নিজেই বলেছিলেন। যাকে আমরা এতক্ষণ খুনি বলে ভাবছিলাম।–অর্থাৎ কচ্ছদেশীয় সেই গোয়েন্দা-তাকে হিঙ্গোয়ানি চিনতেন না। সেই কারণেই গোয়েন্দা হিঙ্গোয়ানির ছবি সঙ্গে এনেছিলেন, যাতে তিনি শিওর হতে পারেন যে ঠিক লোকের সঙ্গেই তিনি দেখা করছেন। অতএব তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হিঙ্গোয়ানির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমায় তিনি চিনতেন ভাল করেই, তাই তুমি নিজের পরিচয় দিলে তাঁর পক্ষে দরজা খুলে দেওয়া স্বাভাবিক।

আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ফেলুবাবু,। পুলিশ পরিষ্কার বলেই দিয়েছে হিঙ্গোয়ানি তার আততায়ীকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করেননি ; দেয়ার ওয়জ নো সাইন অফ স্ট্রগুলি! আমি যদি ছুরি বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতাম, তিনি কি বাধা দেবার চেষ্টা করতেন না?

একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কখনই করতেন না।

কী সেই বিশেষ ক্ষেত্র?

সেটা তোমারই ক্ষেত্র, তরফদার। সম্মোহন। হিঙ্গোয়ানিকে হিপ্‌নোটাইজ করে খুন। করলে তিনি বাধা দেবেন কী করে?

আপনার পাগলামি এখনও যায়নি, ফেলুবাবু! হিঙ্গোয়ানি আমার অন্নদাতা। তাঁর ব্যাকিং-এর উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। আমি কি এমনই মূর্খ যে একেই খুন করব? যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া? আপনি হাস্যালেন মিঃ মিত্তির–আপনি হাসালেন–

এই বেলা হেসে নাও, চমকদার তরফদার; এর পরে আর সে অবস্থা থাকবে না।

আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমার প্রধান অবলম্বন নয়ন চলে গিয়ে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খুন করেছি?

না, কারণ তোমার জবানিতেই জানা যায় যে নয়ন সন্ধ্যাবেলা নিখোঁজ হয়, আর হিঙ্গোয়ানির মৃত্যুর সময় দুপুর আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে।

আপনি এখনও উলটোপালটা বলছেন, মিঃ মিত্তির। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন।

আমার মাথায় জল ঢালো, তরফদার-দেখবে তা বরফ হয়ে গেছে। ... এবারে একটা খবর তোমাকে দিই। আমি কিছুক্ষণ আগে নীচে বইয়ের দোকানটায় গিয়েছিলাম। যিনি দোকানে বসেন সেই মহিলার সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি বলেন গত চার দিনের মধ্যে তাঁর বইয়ের দোকান থেকে কোনও ছোটদের বই বিক্রি হয়নি, এবং কোনও খদ্দেরের সঙ্গে কোনও ছোট ছেলে আসেনি।

শিং-শি মাস্ট বি লাইং!

নো, সুনীল তরফদার–নট শি। মিথ্যাবাদী হচ্ছে তুমি এবং তোমার ম্যানেজার শঙ্কর হুবলিকার। শঙ্করের মাথায় পোর্সিলেনের ছাইদান দিয়ে বাড়ি মেরেছি বলে হয়তো তার মধ্যে কিছুটা চেতনার সঞ্চার হবে–কিন্তু তোমার ঢ্যাঁটামো দেখছি কিছুতেই যাচ্ছে না।

শঙ্করকে আপনিই বেহুঁশ করেছেন?

ইয়েস, সুনীল তরফদার।

কেন?

কারণ সে খুনের কারণ গোপন রাখতে সাহায্য করছিল।

দরজায় বেল বেজে উঠল।

তোপ্‌সে, মিঃ রামচন্দ্রনকে ভেতরে নিয়ে আয়।

দরজা খুলতে রামচন্দ্রন ঢুকে এসে ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই তরফদার রামচন্দ্রনের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই ব্যক্তি বলছেন। আমি খুন করেছি, কিন্তু কোনও কারণ বা মোটিভ দেখাতে পারছেন না।

ফেলুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, শুধু খুন নয়, তরফদার। ভুলো না—ডাকাতিও বটে। হিঙ্গোয়ানির প্রতিটি কপর্দক এখন তোমার হাতে। পাঁচ লাখের উপর–যেটা দিয়ে তুমি নিজের পৃষ্ঠপোষকতা নিজেই করার মতলব করেছিলে।

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল।

তোপ্‌সে–বাথরুমের ভিতরে যে রয়েছে, তাকে বার করে আন তো।

আমি বাথরুমের দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি, নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে বেরিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেল।

শঙ্কর একে তার বাথরুমের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল। আসল ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে আমি শঙ্করের ঘরে যাই, এবং তাকে অজ্ঞান করে নয়নকে নিয়ে আসি। নয়নের মুখ থেকেই শোনো তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রাস এবং তোমার খুন ও চুরির রাস্তা নেবার কারণ।

তরফদারের দিকে চেয়ে দেখলাম তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছে।

নয়ন, বলল ফেলুদা, তরফদার মশাইকে ক বছর জেল খাটতে হবে বলো তো।

তা তো জানি না।

জান না।

কেন, নয়ন? কেন জান না?

আমি তো চোখের সামনে আর নম্বর দেখছি না।

দেখছ না?

না। তোমাকে তো বললাম। –সব নম্বর পালিয়ে গেছে।